মাহবুবুর রহমান

বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সমস্যা

ভূমিকা

বিরোধ বনাম ঐকমত্য (conflict vs. consensus) এই দ্বান্দ্বিকতা কমবেশী প্রায় সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ই উপস্থিত।[১] তবে মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য (consensus on fundamental issues) উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল সমাজে বিরোধের মাত্রা বরাবরই একটু বেশী—কোথাও কোথাও তা সর্বপ্লাবী।[২] শেষোক্ত ক্ষেত্রে এই বিরোধ কখনও কখনও সংঘাতের ও (violence) জন্ম দেয়। উপরন্ত বিরোধের মাত্রা সীমাতিরিক্ত এবং ঐকমত্যের মাত্রা সর্বনিম্ন হওয়ায় এ সব দেশে সরকারী কাঠামো, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা বৈধ ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না এবং প্রকৃত স্থিতিশীলতাও অর্জন করতে পারে না। জাতি গঠনের (Nation building) সূচনালগ্নে একটি দেশের জন্যে তাই যে কর্তব্যটি (task) অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় তাহলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন স্বার্থ, গোষ্ঠী, সংগঠন ও মতকে একটা "সমঝোতামূলক পরিকল্পিত রাজনৈত্রিক প্রক্রিয়া ও কাঠামোর" মধ্যে আনয়ন করা যা উক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা ও স্থিতিশীলতা দান করবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমুহ এবং নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে এ মৌলিক ঐকমত্যের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা লক্ষণীয়। সেখানে বিভিন্ন দল ও গ্রুপের আলাদা আলাদা কর্মসূচী রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের মধ্যে যতই মতবিরোধ

১। "The conflict - consensus dialectic is a fundamental *datum* in all polities", Thomas Pantham, *Political Parties and Democratic Consensus,* Thomas Chocko, 1976, p.1

২। দ্রষ্টব্য S. E. Finer, *The Man on Horse back: The Role of the Military in Politics,* Westview press, Colorado, 1988, p. 247

থাকুক মৌলিক নীতিমালাকে কেউই হুমকির সম্মুখীন করে না।[৩]

বাংলাদেশে—যেখানে উন্নয়নশীল সমাজের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য বর্তমান—জাতীয় ঐকমত্যের অভাব সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হচ্ছে। স্বাধীনতার আঠারো বছর অতিবাহিত হবার পরও দেশে আজ রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রুপ, দল ও নেতৃত্বের মধ্যে চরম মত বিরোধ বিরাজ করছে। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নিয়ে গোলযোগ, এমনকি জাতীয়তার পরিচয় নিয়েই বির্তক চলছে। রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সরকার পদ্ধতি, অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল, রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের ভূমিকা, সমাজে শক্তিধর (dominant) গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা নিয়েও দেশে ঐকমত্যের দারুণ অভাব বিরাজমান। রাজনীতিতে সক্রিয় বিভিন্ন গ্রুপ ও দল এসব প্রশ্নে একে অপরের কেবল যে বিরোধী তাই নয়, বরং বলা যায়, দারুণভাবে অসহিষ্ণু। কেউ চাইছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে, কেউ পুজিবাদী ব্যবস্থা, কেউ বা মিশ্র অর্থনীতির কথা বলছে। কেউ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার বিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের পক্ষপাতী, আর কেউ বা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি অর্থনীতি তথা সামাজিক জীবন পুনর্বিন্যাসে প্রয়াসী। কেউ পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের কথা বলছে, কেউ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের, কেউবা নিজ ভাষায় ব্যাখ্যাকৃত পেশাভিত্তিক বা অংশীদারিত্বের গণতন্ত্রের কথা বলছে। এদিকে সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে কেউ পার্লামেন্টারী গনতন্ত্রের পক্ষে, কেউ বা প্রেসিডেন্সিয়াল, আর কেউ বা পার্লামেন্টারী ও প্রেসিডেন্সিয়াল উভয় ধাঁচের সংমিশ্রণে ভিন্নতর কিছু একটা প্রদানের কথা বলছেন। কেউ জাতীয় ঐক্য, নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতার প্রতীক হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যারাকে রাখার পক্ষপাতী, আর কেউ বা উন্নয়ন কর্মকান্ড সহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী। জাতীয় নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্র নীতির বিষয়েও বিরাজ

৩। যেমন বৃটেনে নির্দিষ্ট ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও লক্ষ্য, পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, আইনের শাসন, নিয়মিত বিরতিতে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল, প্রথার ওপর গুরুত্বারোপ ও এর স্বীকৃতি, সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের রাজনীতিক কর্তৃত্বের অধীন থাকা এসব ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। একই ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রেসিডেন্সিয়াল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সংবিধানের প্রাধান্য, সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় নিরীক্ষা ও আইনের ভাষ্য প্রদান ক্ষমতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিয়মিত বিরতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল, সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের ওপর রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যাপারে মৌল ঐকমত্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ঐকমত্য নষ্ট করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। হাসান উজ্জামান, "বাংলাদেশ ১৯৮৯ ঃ রাজনীতিক সংকটের স্বরূপ ও মৌলনীতিমালার ঐকমত্য" *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৩৪, নভেম্বর ১৯৮৯, পৃঃ ১২,

করছে তীব্র মতবিরোধ। এভাবে অস্পষ্টতা, বিরুদ্ধতা, চরম মেরুকরণ এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সমগ্র রাজনৈতিক পরিবেশকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে।

মোট কথা বাংলাদেশ বর্তমানে এক গভীর সংকটে নিপতিত। এ সংকট রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিষয় সমূহের ব্যাপারে ঐকমত্যের অভাবের সংকট (Crisis of the lack of consensus on fundamental issues)। এর কারণেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে। আর অস্থিতিশীলতা থেকে নৈরাজ্যও জন্ম নিতে পারে। বস্তুতঃ যতদিন মৌলিক বিষয়াবলীতে ঐকমত্যের অভাবের দরুন সংকট বজায় থাকবে ততদিন দেশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করবে না এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিও তরান্বিত হবে না। তাই সমস্যাটির স্বরূপ যথাযথভাবে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। তলিয়ে দেখা প্রয়োজন ঐকমত্যহীনতার পরিধি ও ব্যাপ্তি কতটুকু। কোন্ কোন্ মৌলিক বিষয়ে কি কি দৃষ্টিভংগী বিরাজমান এবং ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব বিরোধপূর্ণ বিষয়ের কোনটি কতোটা দায়ী। উল্লেখ্য, এ প্রবন্ধে এদিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে ঐকমত্যের তাত্বিক দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে যাতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমূহ অবলোকন করতে সুবিধা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে সরাসরি বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং এ সম্পর্কে বিরাজমান বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সবশেষে সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের দৃষ্টিভংগী কি হতে পারে সে সম্পর্কে সামান্য ইংগিত দেয়া হয়েছে।

জাতীয় ঐকমত্য ঃ তাত্বিক ধারণা

ঐকমত্য বা জাতীয় ঐকমত্য সমাজ বিজ্ঞানের একটি বহুল আলোচিত বিষয় হলেও এর সংজ্ঞা নির্ধারণে কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আজো কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া ঐকমত্যকে কোনো সমাজ বিজ্ঞানীই সুনির্দিষ্ট ভাবে সংজ্ঞায়িতও করেননি। কেউ আংশিক ভাবে আর কেউ বা অনেকটা অস্বচ্ছভাবেই একে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ক্ল্যাসিক্যাল রাষ্টবিজ্ঞানীদের মধ্যে De Tocqueville এর সংজ্ঞাটি এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায়। একটি সমাজে কখন ও কিভাবে ঐকমত্য – এর সন্ধান পাওয়া যায় এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "When the minds of all citizens (are) rallied and held together by certain predominant ideas;............ When a great number of men consider a great number of things from the same aspect, when they hold the same opinions upon many

subjects, and when the same occurences suggest the same thoughts and impressions to their minds." [৪]

এখানে কোনো বিষয়ে নাগরিক সাধারণের সমগ্র অংশের (all citizens) একই ধরনের অভিমত পোষণের যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে একটি আদর্শভিত্তিক ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা কোনো বিষয়ে শতকরা একশত ভাগ লোকই একই মতামত পোষণ করবেন– এটা ঐকমত্যের জন্য যেমন জরুরী নয় তেমনি এটা সম্ভবও নয়। আর পরবর্তী সময়ে বিরাট সংখ্যক লোক (Great number of men) বলে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তাও যথেষ্ট অস্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা সমাজের কোন অংশের লোকদের মতামত কিভাবে নিতে হবে তা তিনি উল্লেখ করেননি।

অপর এক রাষ্ট্র বিজ্ঞানী A. Lawrence Lowell ঐকমত্যকে সনাক্ত করেছেন "in regard to the legitimate character of the ruling authority and its right to decide the questions that arise." [৫] অর্থাৎ তাঁর মতে ঐকমত্য হলো বৈধতার নামান্তর। লাওয়েল এর অভিমতটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। কেননা ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি না করলে সরকারী কাঠামো ও রাজনৈতিক পদ্ধতি বৈধতা লাভ করে না এবং স্থায়ীত্বও অর্জন করে না। তবে লাওয়েল এর সংজ্ঞাটিও কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ। কেননা এতে ঐকমত্যের কেবল মাত্র একটি বিশেষ দিকের ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে।

আসলে ঐকমত্যের সংজ্ঞায় এ ধরনের অস্পষ্টতা ও অপূর্ণাঙ্গতার কারণ হলো ঐকমত্য বিষয়টির সাথে অসংখ্য বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে। যেমন ঐকমত্যের প্রসংগ উঠলে সাথে সাথেই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐকমত্য চাই? এখানে কেউ বলছেন, মৌলিক বিষয় সমূহের ব্যাপারে ঐকমত্যের কথা (consensus on fundamental issues)। সেখানেও প্রশ্ন মৌলিক বিষয় সমূহের সংজ্ঞাইবা কি হবে? ঠিক কোন্ কোন্ বিষয় এর আওতায় পড়বে? দ্বিতীয়তঃ কাদের মতকে ঐকমত্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে? একি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল জনসমষ্টির মত, নাকি তাদের মধ্যেকার অংশ বিশেষের মত? এ কি সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের অভিমত, নাকি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণকারী একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মতামত? অথবা ঐকমত্য মানে কি রাজনেতিক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৪। Alexis de Tocqueville, (ed). *Democracy in America,* Phillips Bradley, New York, 1945, quoted in Herbert Mc Closky, "Consensus and Ideology in American Politics" *American Political Science Review,* Vol. 58, 1964, p. 361.

৫। A. L. Lowell. *Public Opinion and Popular Government,* New York, 1926, quoted in Herbrt Mc Closky, *op. cit.,* p. 361.

প্রক্রিয়ার (Decision making process) সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের অভিমতকে বোঝায়? আর ঐকমত্যের প্রকাশটাই বা হবে কিভাবে? একি সাংবিধানিক ঐকমত্য অথবা একি কোন জাতীয় চুক্তি বিশেষ, নাকি এটা নিছক কোনো গণ ভোটের প্রকাশ? ঐকমত্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য এ সমস্ত বিষয়কেই যথাযথ ভাবে বিবেচনা করা অপরিহার্য।

A dictionary of Social Sciences (Glond and Kohl সম্পাদিত, 1964) গ্রন্থে ঐকমত্যকে যে ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এ প্রসংগে তা বেশ প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছেঃ "Consensus may be defined as that general agreement in thought and feeling which tends to produce order where there was disorder. Such general agreement may be accompanied by differences of view on detail." এ সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে ঐকমত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনঃ (১) এটি একটি সাধারণ চুক্তি বিশেষ (general agreement); (২) এ চুক্তির বিষয়বস্তু বা আওতা পরিধি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা এবং অনুভূতি আকাংখা দুটোকেই পরিব্যাপ্ত করে; (৩) ঐকমত্য অস্থিতিশীলতার স্থলে স্থিতিশীলতা আনয়ন প্রয়াসী; (৪) কোন বিষয়ে সাধারণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পরও সমাজে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ও খুটিনাটি বিষয়াদিতে মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতাধীন সকল নাগরিক যেহেতু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সব সময় সমান সচেতন থাকে না, অনেকে এমনকি নির্লিপ্ত ভূমিকাও পালন করেন, কাজেই সমাজের অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীর একটি অংশ যারা রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে মাথা ঘামান তারাই সমাজের মধ্য থেকে কতিপয় বিশেষ ইস্যুকে সামনে নিয়ে নিজেদের অভিমতকে ঐকমত্য হিসেবে উপস্থাপন করেন।[৭] ফলে এ প্রক্রিয়ায় যখন যে মতটি প্রাধান্য লাভ করে তা–ই সে সমাজে ঐকমত্য হিসেবে চালু থাকে। উক্তিটির মধ্যে সত্যতা নিহিত রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 'ঐকমত্যের বিষয়টি কোনোক্রমেই জনমত বিচ্ছিন্ন থেকে চেপে বসতে পারে না। সচেতন, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা দরকার

৬। Glond and Kohl (eds.), *A Dictionary of Social Sciences,* Tavistock Publication, U.K. 1964 (See, Consensus).

৭। David L. Sills, ed., *Encyclopaedia of Social Sciences,* Vol. 3, The Macmillan Company and the Free Press, New York, 1972.

যে, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপেক্ষিতে জনমত প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা।[৮] অর্থাৎ দেখা দরকার যে, সেক্ষেত্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সমষ্টি চেতনা, তাদের প্রয়োজন, অর্থনৈতিক প্রত্যাশাসমূহ, তাদের চিন্তাধারা ধ্যান-ধারণা, যুক্তি আবেগ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধসমূহ 'ঐকমত্য নির্দেশক' মৌল নীতিমালায় প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা। সত্যি বলতে কি, এর উপরই নির্ভর করছে সেটা তাদের কাছে নির্দিষ্ট পর্যায়ে বা দীর্ঘদিন ধরে ঐকমত্য হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

কোনো দেশের জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সমস্যাকে যথাযথরূপে চিহ্নিত করতে হলে সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত জনসাধারণের মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ,অনুভূতি ও দক্ষতার (সহযোগিতার দক্ষতা, সহনশীলতার দক্ষতা, বিশ্বাস করার বা আস্থা রাখার দক্ষতা) (attitudes, beliefs, values, sentiments and skills) সমষ্টি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়ীত্ব ও পরিবর্তনে এবং জাতীয় ঐকমত্য গঠনে জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগির ভূমিকা এবং দক্ষতা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সাধারণত, তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা (১) সংকীর্ণতামূখী (Parochial) (২) নিষ্ক্রিয় (subject) এবং (৩) অংশগ্রহণকারী (Participatory) রাজনৈতিক সংস্কৃতি।[৯] সংকীর্ণতামূখী রাজনৈতিক সংস্কৃতির লক্ষণ হচ্ছে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্কে নাগরিক সাধারণের তীব্র ঔদাসীন্য এবং সচেতনতার অভাব। নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে জনগণ কর্তৃক দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের উপর রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর প্রভাবের ব্যাপারে সচেতন মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ইনপুট কাঠামোর সাথে (যেমন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, স্বার্থজ্ঞাপন, স্বার্থ একত্রীকরণ ইত্যাদি) যোগাযোগ রাখার আবশ্যকতা অনুভব করে না। আর অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে যেখানে ব্যক্তি সমাজরাজনীতি এবং নিজের অধিকার, কর্তব্য ও ক্ষমতার ব্যাপারে পুরোপুরি সজাগ এবং প্রয়োজনে সেটাকে প্রয়োগ করে। বলা হয়ে থাকে যে, অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজ,

---

৮। হাসান উজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

৯। দেখুন G. Almond and B. Powell, *Comparative Politics,* Toronto : Little Brown Company, 1966 G. Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture* " Princeton : Princeton University Press, 1963.

পক্ষান্তরে সংকীর্ণতামূখী ও নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা বেশ জটিল, দুরূহ এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলতঃ সংকীর্ণতামূখী – নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি। কাজেই এখানে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি স্বভাবতই একটু বেশী জটিল এবং সমস্যাদায়ক হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। অবশ্য বাংলাদেশে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান। তবে এখানে দুটো আপাতঃ বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদিও উভয় বৈশিষ্ট্যই চূড়ান্ত বিচারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাকে আয়াসসাধ্য করে তুলছে। একটি হচ্ছে জনসংখ্যার মুষ্টিমেয় অংশ এলিটদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং অপরটি দেশের ব্যাপক জনসাধারণের (Masses) রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এলিটদের মধ্যে রয়েছে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন পেশাজীবী গোস্ঠী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইত্যাদি। এদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অংশ গ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলেও এবং বাংলাদেশের ন্যায় সমাজে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া এবং সে লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তালেও নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি এবং এখনও হচ্ছে না।

১। বাংলাদেশে কোনো স্থায়ী ও বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী (stable and large middle class) বিকাশ লাভ করেনি। বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমল– এ তিন অধ্যায়ে বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে সাময়িক কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে সমাজের একটা শ্রেণী। এদের মধ্যে বৃটিশ আমলের জমিদার শ্রেনী যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫০ সনের জমিদারী উচ্ছেদ আইনের সময় তাদের পূর্বতন সামাজিক অবস্থান হারায়; পাকিস্তান আমলের ক্ষুদে ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং বাংলাদেশ আমলের মুষ্টিমেয় শিল্প উদ্যোক্তা, ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের কথা উল্লেখ করা যায়। এ শ্রেণীটিকে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই শুরু থেকে আজ অবধি ব্যস্ত দেখা যায়। বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে সাময়িক সুযোগ–সুবিধা লাভের দিকেই তাদের মূখ্য এবং বলা যায় একমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে—কোনো রাজনৈতিক মূল্যবোধ লালন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কিংবা সামর্থ্য কোনোটাই নেই। এ ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে পার্লমুটার "Weak, ineffective, divided and politically impotent" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২। রাজনৈতিক নেতৃবর্গের আদর্শ বিচ্যুতি ও জন-বিচ্ছিন্নতা ঃ রাজনৈতিক নেতৃবর্গই দেশের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা, শিক্ষিত করা এবং উদ্বুদ্ধ করার কথা। জনগণ যেমন রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন তেমনি জনগণের কাছে আস্থাভাজন হবার জন্যে রাজনীতিকদেরকেও ব্যাপক জনসাধারণের আশা–আকাংখা, ইচ্ছা–প্রত্যাশা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (committed) থাকতে হয়। কেননা জনসমর্থন এবং জনসম্পৃক্ততাই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের এবং রাজনীতিকদের মূল শক্তি। জাতীয় ঐকমত্য গঠনে রাজনৈতিক দলই পালন করে মুখ্য ভূমিকা। বাংলাদেশে বর্তমানে দু'শতাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে।[১০] অধিকাংশই অবশ্য সাইনবোর্ড সর্বস্ব। বাকী দলগুলোর মধ্যেও মাত্র কয়েকটি দলের কিছুটা সংযোগ ও ভিত্তি রয়েছে গ্রামাঞ্চলে। তাদের রাজনীতির সাথেও জনজীবন খুব একটা যুক্ত নয়। রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মূল তৎপরতা শহরে। তার উপর রাজনীতিক দলসমূহের অভ্যন্তরে উপদলীয় কোন্দল, মতবিরোধ, দল ভাঙ্গাভাঙ্গি এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বার বার দল পরিবর্তন, বক্তব্য পরিবর্তন এবং আদর্শ পরিবর্তন তাদের উপর থেকে জনগণের আস্থাকে বিনষ্ট করছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দল পরিবর্তন এবং আদর্শ পরিবর্তনের সাথে সাথে জাতীয় ঐকমত্য সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং দৃষ্টিভংগীরও পরিবর্তন বেশ লক্ষণীয়।

৩। নিম্নমানের সামাজিক সংহতি (Low Social cohesion) ঃ খ্যাতনামা বিশ্লেষক এ্যামস পার্লমুটার লিখেছেন– "In a society with low social cohesion, personal desires and group aims frequently diverge; the formal structure of the state is not buttressed by an informal one; institutions do not develop readily or operate effectively; social control is ineffective; and channels of communication are few. These conditions indicate the lack of meaningful universal symbols that can bind the society together." [১১] বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি খন্ডীকৃত বা fragmented। এখানকার সামাজিকীরণ প্রক্রিয়ায় অসংগতি রয়েছে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যেও একটা বিরোধী মানসিকতা (oppositional mentality)

১০। ১৯৮৮ সালে এক হিসেবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল ২২৫। দেখুন Mahbubur Rahman, *Factionalism in Party Politics of Bangladesh : A Case Study of the Awami League (1949 - 1984)*, M. Phil Thesis, Dhaka University, 1989, (forthcoming)

১১। Amos Perlmutter & Valerie P. Bennet, *The Political Influence of the Military*, (The Praetorion State অধ্যায়) New Haven, London, 1980, p. 203

মজ্জাগত হয়ে আছে। সরকার ও জনগণের মধ্যে বিস্তর আস্থাহীনতা এবং দূরত্ব সবসময়ই ক্রিয়াশীল। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত শক্তিধর গোষ্ঠী যেমন সামরিক বাহিনী আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ফলে দেশে মূল্যবোধের সংহতি (value integration) সৃষ্টি হচ্ছে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তীব্র মতানৈক্য এবং মেরুকরণ থেকেই যাচ্ছে। রাজনীতিতে সর্বজনস্বীকৃত বৈধতার সূত্র এবং ঐকমত্যের ভিত্তি গড়ে উঠছে না বা উঠতে পারছে না।

বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, তাদের অতীত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একে সংকীর্ণতামূখী নিস্ক্রীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসেবে অভিহিত করা যায়।

প্রথমতঃ দেশের সিংহভাগ মানুষ (শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ) শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তার সাথে রয়েছে গণদারিদ্র্য। অর্থনৈতিক টানাপোড়নে সাধারণ মানুষ এতোটাই কাতর যে, তাদের পক্ষে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সাথে যুক্ত হওয়া কার্যতঃ সম্ভব হয় না। এদিকে শহরের সাধারণ মানুষের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের জনগণের অশিক্ষা, অসচেতনতা এবং দারিদ্রতা আরো ব্যাপক ও ভয়াবহ। উল্লেখ্য বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই বলতে গেলে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। তারা ঐকমত্যের মর্মার্থ বোঝে না, এনিয়ে মাথাও ঘামায় না। একমাত্র ভোটের সময় ছাড়া তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের আর কোন অবকাশ বা সুযোগ পায় না।

দ্বিতীয়ত ঃ সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রীতিমত ধ্বস নেমেছে। সরকারী ক্ষমতা গ্রহণ, তাতে টিকে থাকা এবং সরকার পরিবর্তন—কোনো ব্যাপারেই যেন বৈধতা অবৈধতার কোনো বালাই নেই। সরকার এবং বিরোধী দল—উভয়ের উপর থেকে সামগ্রিক জনগণেরই আস্থা যেন হ্রাস পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত অর্থাৎ এরশাদ শাসনামলে জাতীয় পর্যায়ের কয়েকটি নির্বাচনের হালচালই তার প্রমান। অর্থাৎ পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকেই জনগণের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে ——— তারা নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে। ব্যাপক সাধারণের এই নির্লিপ্ততাবোধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও ততই বিলম্বিত এবং কষ্টসাধ্য হতে বাধ্য।

মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যের সমস্যা ঃ বিরোধপূর্ণ বিষয় সমূহ

জাতীয়তার স্বরূপ নির্ধারণ

বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এদেশের মানুষের জাতিগত পরিচয় নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি সবসময়ই বিরাজ করেছে। জাতীয়তার পরিচিতি ও সংজ্ঞা এখানে বার বারই পরিবর্তিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে এদেশবাসী ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং বাঙ্গালী কিংবা বাংলাদেশী ইত্যাকার বিভিন্নমূখী পরিচয়ে পরিচিত হয়েছে। চল্লিশ দশকের শেষের দিকে মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের যখন জনপ্রিয় হয়ে উঠে তার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধিবাসীরা মিলে এক জাতি এই তত্ত্বটি কম জনপ্রিয় ছিল না। তার পর সাতচল্লিশে এসে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের মানুষ হয়ে গেল পাকিস্তানী। তখন আবার প্রশ্ন উঠল পাকিস্তানী জাতিটা কাদেরকে নিয়ে পরিচিত হবে। দেখা গেল এক্ষেত্রে ধারণা পরিষ্কার নয় কারোরই। এমনকি দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রবক্তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহরও নয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতের মুসলমানরা ছিল একটি জাতি, পরে বলা হলো পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর পাকিস্তানী মুসলমানদের নিয়ে হবে পাকিস্তানী জাতি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রথম গণ-পরিষদের অধিবেশনে তাঁরই ভাষণ অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানীকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তানী জাতি[১২] মোটকথা, জাতীয়তার ধারণায় জটিলতা এবং অসচ্ছতা ছিল পরিস্ফুট। এদিকে বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের) মানুষ সাতচল্লিশে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে স্বাগত জানালেও অচিরেই তাদের মোহমুক্তি ঘটে। ইসলামের নামে যখন তাদের উপর বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, পাকিস্তানের কপট শাসকবর্গ কর্তৃক ইসলামের নামে গৃহীত নীতি যখন এখানকার জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার হরনের মাধ্যম হয়ে উঠে তখন নিজেদের ভাষা ও ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যকে পুঁজি করেই পূর্ব বাংলার জনগণ সন্ধান করে নতূন জাতিসত্তার। দীর্ঘ ২৪ বছরের লড়াই এবং একাত্তরের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে উত্থান ঘটে এই নতুন জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

কিন্তু স্বাধীনতার পর এই নতুন জাতি-রাষ্ট্রের নাগরিকদের জাতীয়তার নামকরণ

১২। আবদুল হক, "দোদুল্যমান জাতীয়তা", দ্রষ্টব্য মুহম্মদ জাহাংগীর (সম্পাদিত) *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭ পৃঃ ৩৬ আরো দেখুন G.W. Chowdhury, *Constitutional Development in Pakistan.* London, Longman, 1959, pp. 63-64.

১৩। বিস্তারিত মতামতসমূহের জন্যে দেখুন, মুহম্মদ জাহাংগীর (সম্পাদিত) *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক;* আসহাবুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও অন্যান্য প্রবন্ধ* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ঢাকা, ১৯৮৭ পৃঃ ১৫-৭১।

ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা নিয়েও শুরু হলো পুনরায় সমস্যা। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জাতীয়তাবাদ বিতর্ক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠে। বিষয়টি এতটাই বিতর্কিত হয় যে আমাদের রাজনৈতিক অংগনে এই প্রশ্নে দুটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয়। বাংগালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ—এই দুই ধারায় বিষয়টি আলোচিত হতে থাকে। এই প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। অথচ একটি স্বাধীন দেশের জন্য জাতীয়তার পরিচিতি নিয়ে এ রকম বিতর্ক থাকা মোটেও বাঞ্চনীয় নয়। এক্ষেত্রে যারা বাংগালী জাতীয়তাবাদের কথা বলেন তাদের বক্তব্য হলো ঃ

ক. আবহমান কাল যাবৎ এদেশের মানুষ বাংগালী বলে পরিচিত। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় আমাদের এ জাতির পরিচয় নির্ধারিত হয়েছে। বাংগালী হিসেবে আমাদের নৃতাত্বিক পরিচয়ও তাই।

খ. বাংগালী শব্দটা অসাম্প্রদায়িক।

গ. ভাষা ও ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যকে মূলভিত্তি ধরলে বাংগালী জাতীয়তাবাদ বলাই শ্রেয়।

ঘ. পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় বাংগালী জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটে।

যেমন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সব দ্বিধাকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের বাংগালী সত্তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। সেই থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদেরই অগ্রগতি ঘটে। বাংগালী সংস্কৃতির উপর ন্যূনতম আঘাত হানার চেষ্টা পূর্ব বাংলায় ধিকৃত হয়। বাংলা ভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ধারা এই বাংগালী মনোভাবকে পুষ্ট করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই বাংগালী জাতীয়তাবাদের বিজয় ঘটে। বস্তুতঃ আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও নাগরিকত্বের পরিচয় অভিন্ন হয়ে উঠে যখন আমরা বাংগালী বলে পরিচিত হই।

পক্ষান্তরে যারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা তাদের বক্তব্য হলো ঃ বাংলাদেশের জাতীয়তা হবে বাংলাদেশী জাতীয়তা— এটাই স্বাভাবিক এবং সত্যও বটে। তারা বলেন, এর বিপরীতে যারা বাংগালী জাতীয়তার কথা বলেন তাদের অভিমত শুধু যে রাজনৈতিক ভাবেই ভ্রান্ত তাই নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও অবাস্তব। এমনকি রাজনৈতিক দর্শন হিসেবেও এর অসারতা স্বপ্রমাণিত। এ ধারার প্রবক্তাগণ লিখেছেন যে, "বাংগালী জাতীয়তা বললে বহু জাতিত্ব বা মাল্টি ন্যাশনালিজম এর কথা এসে পড়ে এবং এর দ্বারা বাংলাদেশের মানুষের সত্যিকার এবং পুরো পরিচয় ফুটে উঠে না। কেননা বাংলাদেশের বাইরেও তো কয়েক কোটি বাংগালী আছেন। আমরা কি তাদেরকে

আমাদের জাতির শামিল করতে পারি ? বস্তুতঃ বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গের ও অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলের মানুষ একই উৎস থেকে উদ্ভুত হয়ে থাকতে পারে। উভয়ে বংগ ভাষাভাষী হতে পারে, উভয়ের আচার আচরণেও খানিকটা মিল থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় ও সংস্কৃতিতে জাতীয় ভাবাদর্শে তারা কি একও অভিন্ন ? নিশ্চয়ই তা নয় বরং অনেক দিক দিয়ে ভিন্ন এবং কতক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন যে, দু'য়ের মৌলিক প্রভেদগুলো হাজার বছর আগেও যা ছিল আজও তাই আছে। তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দুয়ের অভিন্ন সংস্কৃতি ও অভিন্ন জাতীয়তা সত্য নয়।"[১৪] একজন বিশ্লেষক লিখেছেন, "এপার বাংলা ওপার বাংলার পার্থক্য চিরন্তন। এ প্রভেদ মননের মানসের, আবেগের, অনুভূতির, ধর্মের–কর্মের, নামের–নিশানের, ঐতিহ্যের উত্তাধিকারের, খোরাকের–পোশাকের, আদবের–লেহাজের কায়দা কানুনের, জীবন বোধের , জীবন ধারার, জীবন দর্শনের এবং জীবন সাধনার। সুতরাং বলাই বাহুল্য বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তা ও পরিচয়ের ভিত্তি হবে বাংগালী নয় বাংলাদেশী।"[১৫]

বাংলাদেশী জাতীয়তার পক্ষাবলম্বনকারীরা অপর একটি যুক্তিও উপস্থাপন করেন, তা হলো এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের অন্তর্ভুক্তকরণ সম্ভব হয়। স্বাধীনতোত্তরকালে সরকার প্রধান কর্তৃক উপজাতীয়দেরকে 'বাঙ্গালী' হবার আহ্বান জানানো সত্বেও এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এ প্রসংগে তারা তা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশী জাতীয়তার প্রবক্তারা তাই বলেন, 'বাঙ্গালী' কথাটি শুধু আংশিক নয়, ভ্রান্তও বটে; পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি সামগ্রিক সত্যকে তুলে ধরে, তাই তা পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ। মোটকথা, জাতীয়তার স্বরূপ নির্ধারণে আমাদের মধ্যে অস্পষ্টতা, এবং বিরোধ রয়েছে––এতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু বাঙ্গালী জাতীয়তা বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তার এ বিতর্ক আদৌ মৌলিক এবং প্রাসংগিক কিনা তা একটু পর্যালোচনার দাবী রাখে।

প্রথমতঃ ধর্মের প্রসংগ ধরা যাক। বাংগালী বললেই ধর্ম বাদ পড়ে যায় আর বাংলাদেশী বললেই ধর্ম যুক্ত হয়—এ বক্তব্যের মধ্যে যৌক্তিকতা কোথায়? আর বাংগালী মুসলমানের ধর্মীয় পরিচয় প্রদানের জন্যে 'বাংগালী মুসলমান' বলতে আপত্তি কোথায়? কেননা বাংলাদেশের মানুষ ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাংগালী আর ধর্মীয় পরিচয়ে তারা বাঙ্গালী মুসলমান বা বাংগালী হিন্দু ইত্যাদি।

১৪। উদ্বৃত, খন্দকার আব্দুল হামিদ, 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ', দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ জাহাংগীর প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।

১৫। খন্দকার আবদুল হামিদ, ঐ পৃঃ ১৩০।

তাছাড়া বাংগালী কথাটা বর্তমানে আর সমস্যাদায়ক নয় একারণে যে পশ্চিম বংগের অধিবাসীরা বর্তমানে নিজেদের পরিচয় ভারতীয় বা Indian বলেই দিয়ে থাকে। 'বাঙ্গালী' পরিচয় বর্তমানে কেবল বাংলাদেশের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এমনকি বাংলাদেশী বললে উপজাতীয়দেরও সম্পৃক্ত করা হয় বলে যে যুক্তি উথাপন করা হয়েছে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা কিন্তু তাকেও সমর্থন করে না। কেননা, পঁচাত্তরের পর থেকে 'বাঙ্গালী' বলার বদলে 'বাংলাদেশী' চালু করা সত্বেও কি উপজাতীয়দের তৎপরতা কোনো অংশে কমেছে? সত্য কথা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা মূলতঃ একটি রাজনৈতিক সমস্যা। রাজনৈতিক ভাবেই এর সমাধান করতে হবে। রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া কেবলমাত্র 'বাংলাদেশী' নামের ছড়া বুলানো নিষ্ফল শ্রম এবং ভ্রান্ত কৌশলও বটে। অপরদিকে যারা বাংগালী পরিচয়ের ব্যাপারে অনড় তাদেরকেও প্রশ্ন করা যায় যে, পৃথিবীর অনেক জাতিই যেহেতু নিজেদের ভৌগলিক তথা রাষ্ট্রিক পরিচয়ের মাধ্যমে জাতীয়তা প্রকাশ করেন সেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মানুষের পরিচয় 'বাংলাদেশী' বললে অশুদ্ধ হবারই বা কি থাকতে পারে। পশ্চিম বংগের অধিবাসীরাও তো Ethnicity-র দিক থেকে বাংগালী হওয়া সত্বেও জাতীয়তার পরিচয় দিচ্ছে ভারতীয়।

সরকার পদ্ধতি ও প্রশাসনের মৌল কাঠামো

রাজনৈতিক পদ্ধতি ও প্রশাসনের মৌল কাঠামোর প্রকৃতি কি হবে এনিয়ে বাংলাদেশে দীর্ঘ দিন যাবৎ তীব্র মতবিরোধ বিরাজ করছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে বাংলাদেশে কেউ কেউ চাইছে সংসদীয় গণতন্ত্র, কেউ প্রেসিডেন্সিয়াল, আর কেউবা পার্লামেন্টারী ও প্রেসিডেন্সিয়াল উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে নবতর কিছু একটার পক্ষপাতী। এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বপক্ষে নিজেদের রায় ঘোষণা করে। যাহোক, সংগত কারণেই একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন করা হয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার বহাল ছিল। তারপর চালু হয় বহুদলীয়, সংসদীয় সরকার পদ্ধতির শাসন। ১৯৭৩ সালের নির্বাচন বহুদলীয় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির অধীনেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মাত্র দু বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী একদলীয় পদ্ধতিতে বাকশাল গঠনের মাধ্যমে পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে একদলীয় ব্যবস্থা রহিতকরণের মাধ্যমে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনরায় চালু হয়। কিন্তু আজ অবধি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিই বহাল রয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ ও বি, এন, পি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে সরকার পরিচালনা করলেও বর্তমানে এ উভয় দলেরই বক্তব্যই ভিন্ন ধরণের। আওয়ামী লীগ বর্তমানে সংসদীয় সরকারের জোরালো প্রবক্তা। বি, এন, পি, এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু বলতে নারাজ। তবে তাদের প্রবণতা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির দিকে। এদিকে বর্তমান ক্ষমতাশীন জাতীয় পার্টিসহ আরো কিছু দল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির পক্ষপাতী। তাদের অভিমত হলো পচাত্তরের পর থেকে এযাবৎ যেহেতু তিনটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্যে জনগণ সরাসরি ভোটদান করেছে কাজেই এ পদ্ধতি জনগণের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত। অপরদিকে এর বিরুদ্ধাবাদীদের অভিমত হলো সরকার পদ্ধতি হিসেবে প্রেসিডেন্টসিয়াল ও সংসদীয়—দুটো পদ্ধতিই গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হলেও সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত কল্পে সংসদীয় সরকার পদ্ধতিই উত্তম বলে বিবেচিত হয়ে আসছে সর্বত্র। তারা উদাহরণ টেনে বলেন যে, সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই দেখা যায় যে, প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি কার্যতঃ এক ব্যক্তির শাসনে পর্যবসিত হয়। এ সব দেশে তাই ক্যারিজমেটিক নেতৃত্ব এবং সামরিক শাসকগণকে দেখা যায় যে, তারা সবসময়ই প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিকেই তাদের উপযোগী শাসন পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতার এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ফলে এ ব্যবস্থায় শুধু যে স্বৈরাচারের দ্বারই উন্মুক্ত হয় তা-ই নয়, জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিকাশও হয় মারাত্বকভাবে বিঘ্নিত। সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তির ইংগিতে দল ভাংগাগড়া, মন্ত্রীত্ব বন্টন, সুবিধাবাদ এবং চাটুকারিতার এমন এক ন্যাক্কারজনক প্রক্রিয়া শুরু হয় যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কেই মানুষের শ্রদ্ধা এবং আস্থা নষ্ট হয়। এ গ্রুপের তাই সুস্পষ্ট অভিমত হলো, প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি নয় কিংবা বর্তমানে প্রচলিত সংসদীয় ও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সংমিশ্রণে ভিন্নতর কোন কিছু নয়, বরং প্রকৃত সংসদীয় সরকার পদ্ধতি অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্টের কাছে পরিপূর্ণ জবাবদিহি করতে বাধ্য সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল বাংলাদেশে পূর্ণ দায়িত্বশীল এবং প্রকৃত অর্থে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এদিকে দেশে প্রশাসনের কাঠামো কি হবে অর্থাৎ উন্নয়নমূখী প্রশাসনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কাঠামোর রূপ ও স্তর বিন্যাস কি হবে—তা নিয়েও রয়েছে বিস্তর মত পার্থক্য। ফলে একেক সরকারের আমলে প্রশাসনের কাঠামোর আমূল সংস্কারের নামে একেক ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়, অবকাঠামো নির্মাণের নামে চলে ব্যাপক অর্থ ব্যয় এবং অপচয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পুরো কাঠামোটিও বানচাল করে দেয়া হয়। মুজিব আমলে জেলা প্রশাসন, জিয়াউর রহমানের গ্রাম সরকার এবং বর্তমান

এরশাদ সরকার প্রবর্তিত উপজেলা পদ্ধতির কথা এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশাসনিক কাঠামোর মৌল রূপ সম্পর্কে এ মতানৈক্যের ফলশ্রুতিতে দরিদ্র জনগণের কষ্টার্জিত অর্থেরই যে কেবল অপচয় হচ্ছে তাই নয়, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মক ভাবে।

উন্নয়ন কৌশল

অর্থনৈতিক নীতি বা উন্নয়ন কৌশল একটি দেশের জন্যে অত্যন্ত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের ন্যায় একটি দরিদ্র পশ্চাৎপদ ও উন্নয়নশীল দেশের জাতিগঠনের কাজে ব্যাপক জনগণের উন্নয়ন সাধনে সক্ষম উন্নয়ন কৌশল হবে কোনটি ? এ প্রশ্নে স্বাধীনতা পুর্ব কাল থেকেই আমাদের দেশে বিতর্ক চলে আসছে এবং আজো তা অব্যাহত রয়েছে। এটা অবশ্য উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, আমাদের দেশে পুজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার যেমন সমর্থক রয়েছে তেমনি রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সমর্থক। কেউ কেউ আবার মিশ্র অর্থনীতির কিংবা ইসলামী অর্থনীতির কথাও বলছেন। তবে আমাদের এখানে উন্নয়ন কৌশলের দ্বন্দ্বটা এসব ব্যবস্থার আওতায় হলেও তা বর্তমানে আরেকটু নির্দিষ্ট (specific) কতকগুলি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে। যেমন ব্যক্তিগত খাত বনাম রাষ্ট্রীয় খাত, জাতীয়করণ বনাম বিরাষ্ট্রীয়করণ, বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়, ব্যবহার ও উপযোগিতা তথা আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার পথ ও পন্থা কি হবে, জাতীয় আয় ও সম্পদের বন্টন বৈষম্য এবং উন্নয়নের গতিধারা এসব নিয়ে বিতর্ক চলছে।

যারা মুক্ত অর্থব্যবস্থার আওতায় বিরাষ্ট্রীয়করণসহ অবাধ ব্যক্তি উদ্যোগের পক্ষপাতী তারা জাতীয়করণসহ অর্থনীতিতে যে কোনো নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। তাদের মতে সঞ্চয় বিনিয়োগ প্রতিযোগিতা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন– এসব হচ্ছে উন্নয়নের সোপান। রাষ্ট্রীয় খাতকে তারা আমলাতান্ত্রিক এবং দলীয় লুটপাটের অবাধ রাজত্ব, জনগণের সম্পদের অপচয়, লোকসান ও স্থবির অর্থনীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। তারা উদাহরণ হিসেবে স্বাধীনতোত্তর কালে জাতীয়করণ নীতির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেন। এখানে উল্লেখ্য, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বৃহদাকারে জাতীয়করণ কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালে তদানীন্তন সরকারের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে (১) স্থির সম্পদের পরিমান ১৫ লক্ষ টাকার বেশী এমনসব পরিত্যাক্ত শিল্প ইউনিট এবং (২) স্থির সম্পদের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকার বেশী এমনসব পাট, বস্ত্র, ও চিনি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে আনা হয়। কিন্তু এ ব্যাপক রাষ্টায়ত্তকরণের পর অবাধ চুরি, দুর্নীতি,

অযোগ্যতা ও ব্যাপক লুটপাটের বিস্তৃতি ঘটেছিল।[১৬] উৎপাদন অস্বাভাবিক ভাবে নেমে গিয়েছিল, সরকারকে বিপুল পরিমাণ ভর্তূকি দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রাখতে হয়েছিল। শ্রমিকদের একটা অংশ কাজ না করে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং রাষ্টায়ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মূলধন, বিনিয়োগকৃত তহবিল, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল এমনকি কারখানায় বসানো যন্ত্রপাতি পর্যন্ত চুরি করেছিল বলে অভিযোগ উঠে।[১৭]

পচাত্তরের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে। এ সময়ে বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানার খাত গড়ে তোলার প্রবণতা জোরদার হয়ে উঠে এবং ১৯৭৬ সালের পর থেকে এই লক্ষ্যে সরকার একের পর এক নীতি ঘোষণা করতে থাকে। বর্তমান সরকার অর্থাৎ এরশাদ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বিরাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যক্তিমালিকানার খাত গড়ে তোলার প্রয়াস আরো প্রবল এবং সক্রিয় হয়ে উঠে। বলতে গেলে এর দ্বার হয় অবারিত। পূর্বে রাষ্টায়ত্তকৃত অনেকগুলো ব্যাংক, বীমা কোম্পানী ও শিল্প কারখানা ইতিমধ্যে সেগুলোর 'প্রাক্তন মালিকদের' হাতে সব দায় মওকুফ করে রাষ্ট্রীয় ভূর্তুকীর মাধ্যমে পরিসম্পদের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে ক্ষেত্রে প্রাক্তন মালিকদের পাওয়া যায়নি অথবা ফেরৎ নিতে আগ্রহ দেখায়নি, সেখানে শিল্পকারখানাগুলো নিলামে সর্বোচ্চ ডাকদাতার কাছে দায় মওকুফ করে কিস্তিতে কেনার জন্যে ঋণ দিয়ে বিক্রয় করা হয়েছে।

এতদসংগে উল্লেখ্য যে, এসব কাজের ফল আগের মতোই ক্ষতিকর হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।[১৮] কাংখিত ন্যূনতম প্রবৃদ্ধি অর্জন তো হয়নিই বরং সমাজে অসাম্য ও মেরুকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাকথিত 'প্রাক্তন মালিক' অথবা নতুন মালিক উৎপাদনমূখী পথ গ্রহণ করেনি বরং উল্টো তারা এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানাগুলোয় নানান উপায়ে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে এবং এদের অনেকেই নতুন নেয়া শিল্প পরিসম্পদ ও সরকার প্রদত্ত ঋণ তসরুফ করে সংগৃহীত মূলধন বিদেশে পাচার করছে। অভিযোগ রয়েছে যে, ক্ষমতাসীনদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগের দরুন

১৬। তারেক ফয়সল, 'বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ', দ্রষ্টব্য, আসহাবুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*; পৃঃ ১০৭।

১৭। ঐ

১৮। দেখুন, আবদুল গফুর, 'জাতীয়করণের অর্থনীতি ও সাম্প্রতিক উন্নয়ন কৌশল,' দ্রষ্টব্য, *জাতীয় শোক দিবসের প্রকাশনা*, সম্পাদনায় সাজেদা চৌধুরী, ঢাকা, ১৯৮৬, আরও দেখুন Rehman Sobhan and Ahmad Ahsan, 'Disinvestment and Denationalization : Profile and Performance,' *BIDS Research Report*, Dhaka, July, 1984.

তাদের এসব মারাত্মক অর্থনৈতিক অপরাধের জন্যে সরাসরি দায়ী করাও সম্ভব হচ্ছে না। এ উন্নয়ন কৌশলকে তাই অনেকে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আত্মসাতের কৌশল হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৯]

যারা রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির বিরাষ্ট্রীয়করণের বিরোধী তাদের কেউ কেউ উপরোক্ত অভিযোগ ছাড়াও নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেন। সেটি হচ্ছে ১৯৭২ সালের শিল্পখাত ও ব্যাংক বীমা জাতীয়করণ নীতি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আশা আকাংখার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ আমাদের স্বাধীনতার পেছনে অন্যতম প্রেরণা হিসেবেও কাজ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিছক একটি জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে গণ্ডীভূত ছিল না বরং এর অন্যতম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানী আমলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের বিরুদ্ধে একটি বিকল্প ব্যাপক জনসাধারণের উন্নয়ন সাধনে সক্ষম বন্টনমূলক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এজন্যেই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের রাষ্ট্রীয় আকাংখার সাথে জাতীয়করণ কর্মসূচীর ছিল নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।[২০] পাকিস্তানী আমলের অর্থনৈতিক নীতি ছিল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর পুঁজিবাদী বিকাশ যার পরিণতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য ও গণদারিদ্র বেড়ে গিয়েছিল, আয় বন্টনে অবনতি ঘটেছিল, প্রকৃত মজুরী কমে গিয়েছিল এবং কৃষিপণ্যের দামের তুলনামূলক অবনতি ঘটেছিল। এর ফলে ২২টি পরিবারের হাতে বিপুল পরিমান সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছিল এবং বিপরীতে দেশের সাধারণ মানুষ দ্রুত দারিদ্র্য সীমার নীচে তলিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের জনগণ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানী অর্থনৈতিক নীতির দেউলিয়া চরিত্র সম্পর্কে নিঃসন্দেহে হতে থাকে এবং সাথে সাথে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের সন্ধান করে। ষাটের দশকের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই অর্থনৈতিক বিকল্পের রূপরেখা সম্পর্কে জনগণের ধারণা বিকশিত হতে থাকে। এবং তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই বড় বড় শিল্প রাষ্ট্রীয়ত্তকরণকে তাদের মেনিফেষ্টোতে গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে আওয়ামী লীগ শিল্প রাষ্ট্রীয়ত্তকরণকে দলের মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা জনসাধারণের কাছ থেকে সে ম্যাণ্ডেটও লাভ করে। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নীতিকে তাই সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত কোনো নীতি হিসেবে গণ্য করা যায় না। বরং এর অন্যথা হলে তা হতো জনগণের দেওয়া

১৯। দেখুন, আখলাকুর রহমান, "যুগ-সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ, পলিটিক্যাল ইকোনমি বক্তৃতা", সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র ১৯৮৪।

২০। আবদুল গফুর, *প্রাগুক্ত*।

ম্যাণ্ডেন্ট অমান্য করা। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে যারা ক্ষমতাসীন হয়েছে তারা সবাই রাষ্ট্রীয়ত্ত খাতের সংকোচন ও বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির অনুসারী। অথচ তারা কেউই তাদের নীতির স্বপক্ষে জনগণের কাছ থেকে ম্যাণ্ডেন্ট পাননি এবং নেবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। বৈধ ও গনতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের পূর্ব সম্মতি ছাড়া জাতীয় সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরকে তাই তারা একটি গর্হিত অপরাধ হিসেবেও গণ্য করে থাকেন।[২১]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, জাতীয় আয় ও সম্পদের বন্টন বৈষম্য, বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়, ব্যবহার ও উপযোগিতা বনাম আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা—এসব নিয়েও আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচণ্ড বিতর্ক চলছে। এ সবের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারটি সাম্প্রতিক কালে তালিকার শীর্ষে স্থান লাভ করেছে বলা চলে। প্রশ্ন উঠেছে, বৈদেশিক সাহায্য আসছে আসলে কার স্বার্থে? কারা তার সত্যিকার গ্রহীতা? বৈদেশিক সাহায্য কি আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করছে নাকি পরনির্ভরশীলতাকেই বাড়িয়ে তুলছে কেবল? অথবা এ সাহায্য আমাদের কতটা কাজে আসছে? বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের অভিমত হলো আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্য বৈদেশিক সাহায্য–নির্ভরতা তৈরী করে চলেছে এক বিপদজনক পরিস্থিতি। বাংলাদেশ একটা গরীব ও ছোট দেশ। এরূপ দেশের জন্য 'ঋণ জাল' একটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। বৈদেশিক সাহায্যের দু'টো অংশ থাকে ঃ একটা অনুদান এবং আরেকটা ঋণ। ঋণটা সুদে আসলে পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধের হারটা যখন এমন একটা স্তরে পৌছে যেখানে গ্রহীতা সেটা পরিশোধ করতে বাধ্য হয় আরো ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে, তখন ঋণদাতারা তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থটাকে গ্রহীতার উপর চাপাতে থাকে। গ্রহীতা দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাকে ধীরে ধীরে ঋণদাতারা নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করতে থাকে। ব্যাংলাদেশেও তেমনটি ঘটছে বলে উপরোক্ত অর্থনীতিবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২২]

এখানে উল্লেখ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিস্তৃত বিবরণ এবং অর্জিত প্রবৃদ্ধির কথা জাতীয় প্রচার মাধ্যম সহ বিভিন্ন সভা, সমাবেশগুলিতে উপস্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে অর্থনীতিবিদদের একটা অংশের

২১। ঐ

২২। আখলাকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮ 'Quazi Kholiquzzaman, "Counting theCosts of Foreign Aid in Bangladesh" in M. A. Hafiz and A. R. Khan, (eds), *Nation Building in Bangladesh : Retrospect and Prospect*, BIISS, 1986 p. 141-151.

অভিমত হলো, সারা বাংলাদেশটা (বন্যার সময় ছাড়াই আজ হয়ে উঠেছেরিলিফমুখী, আয় থেকে আমাদের ব্যয় বেশী, মেকী ভোগ বৃদ্ধি সারা দেশে সৃষ্টি করেছে এক মেকী স্বচ্ছলতা, এটাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর অন্তরালে ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হচ্ছে যে দুর্বিসহ দারিদ্র ও বন্টন বৈষম্য তা ঢেকে রাখার জন্য চলছে দুনির্বার অপচেষ্টা।[২৩]

বস্তুতঃ উভয় গ্রুপের মতামত ও বিতর্ক থেকে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তাহলো, উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশকে আজ বেছে নিতে হবে এমন একটা সুনির্দিষ্ট এবং যথোপুপযুক্ত পথ যে পথে পর্যাপ্ত হবে আমাদের বিকাশের হার, ত্বরান্বিত হবে আমাদের হৃদয় বিদারক দারিদ্র মোচন প্রক্রিয়া। এখানে নেই কোন সুযোগ দ্বিমতের কিংবা দ্বিধা দ্বন্দেব্ব এবং অবকাশ নেই কোন দীর্ঘ সুত্রীতার। কিন্তু সমস্যা একটাই, তাহলো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার উপায় কি? উন্নয়ন কৌশল নিয়ে তাই আলোচনা পর্যালোচনা এবং বিতর্কের অন্ত নেই।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের ভূমিকা

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশে যেমন সমরূপতা অর্থাৎ homogeneity রয়েছে তেমনি জনসংখ্যার ধর্মীয় অনুপাতের দিক থেকেও বাংলাদেশের এই সমরূপ (homogenous) বৈশিষ্ট্যই ফুটে ওঠে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশী মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় সম্প্রীতিও অনেকটা নজিরবিহীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিশেষ করে এখানকার রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে ঐকমত্যের দারুণ অভাব বিরাজমান। বিশ্লেষকদের মতে, এর কারণ হলো "বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আবেদন যেমন প্রবল, তেমনি প্রবল ধর্মীয় চেতনার, বিশেষ করে ইসলামী আদর্শের"।[২৪] যারা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা তারা ধর্মকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের আওতার মধ্যেই সীমিত রাখার পক্ষপাতী এবং রাষ্ট্রকে একটি আইনানুগ 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় জীবনকে পুরোপুরি ধর্মের আওতামুক্ত রাখতে চান। পক্ষান্তরে যারা ইসলামী আদর্শের কথা বলেন তারা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করতে প্রয়াসী।

২৩। দেখুন, আখলাকুর রহমান, "যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ, পলিটিক্যাল ইকনমি বক্তৃতা", ১৯৮৪, ঢাকা সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৮৪, পৃ-১০।

২৪। এমাজউদ্দিন আহমদ, 'বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ঃ ক'টি প্রশ্ন', দ্রষ্টব্য, মুহাম্মদ জাহাংগীর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮ "আরও দেখুন, Talukder Maniruzzaman, Bangladesh Politics : Secular and Islamic Trends", in Rafiuddin Ahmed (ed), *Islam in Bangladesh,* Bangladesh Itihash Samity, p. 217-57.

শেষোক্ত মতানুসারীদের মধ্যে আবার রয়েছে দুটো অংশ—একটি অংশ বাংলাদেশকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র করতে চান, অপর অংশটি দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষনার বিরোধী তবে সংবিধানে সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের ধর্মীয় চেতনার বিশেষ উল্লেখের পক্ষপাতী।

যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন তাদের অভিমত হলো ঃ[২৫]

ক)ধর্ম মূলতই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেই তাকে ব্যক্তি জীবনেই সীমিত রাখা শ্রেয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মকে জড়িত করলে একদিকে যেমন ধর্মীয় বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ–বিদ্বেষ রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের গতিপথকে বিঘ্নিত করে তেমনি অপরদিকে রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্য ধর্মের অপপ্রয়োগের ফলে ধর্মের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্য বিলোপ হয় এবং ধর্মের প্রতি জনসাধারণের আস্থাও ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

খ) ধর্ম আর রাজনীতিতে অহি–নকুল সম্পর্ক। একটি পারলৌকিক– জীবন নির্ভর, অপরটি ইহলৌকিক জীবন–সর্বস্ব। এ দু'য়ের সমন্বয় কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। আর এটা কেউ করতে গেলে তখন ধর্ম আর ধর্ম থাকে না এবং রাজনীতিও হয়ে পড়ে ঘোলাটে। একজন লেখক লিখেছেন 'ডালে–চালে মিশিয়ে খিচুড়ি হয়, কিন্তু ধর্ম আর রাজনীতি মিশিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি হয় না। স্রেফ ভাওতা দেওয়া চলে শুধু ওই রাজনীতির মাধ্যমে'।[২৬]

গ) অতীতে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে দেখা গেছে যে, রাজনৈতিক নেতারা যখন নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা গণস্বার্থকে পদলিত করেছেন, যখন তারা নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য গণসমর্থন লাভের কোন পথই খুঁজে পাননি, তখনি তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে এনে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলাদেশেও সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর থেকে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ঘ) ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। বরং এর অর্থ হলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার প্রতিরোধ করা। ধর্ম তার নিজস্ব ক্ষেত্রেই (মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে) বিচরণ করবে। কেবল মাত্র রাজনীতির দেয়াল ডিংগিয়ে রাষ্ট্রীয় মঞ্চে তার অধিকার প্রবেশই রোধ করা হয় এ নীতির মাধ্যমে।

২৫। ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষের অভিমত সমূহের জন্যে দেখুন, আবুল ফজল, *সমকালীন চিন্তা*, ঢাকা, মুক্তধারা, তৃতীয় প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৮৩ এবং রশীদ আল ফরুকী, "ধর্ম ও রাষ্ট্র", ঢাকা ঃ অক্ষর, ১৯৮৭, *সাপ্তাহিক আগামী*, ১৩–২৭ এপ্রিল, ১৯৯০।

২৬। আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

ঙ) একাত্তর সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞে এবং পাশবিকতা পরিচালনার সময়েও ধর্মকে ঢাল হিসেবে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং কতিপয় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল যেভাবে তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিল তাতেও উপরোল্লিখিত ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রত্যয়ই জোরদার হয়।

চ) সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর ব্যাপী পাকিস্তানী শাসকচক্রের ইসলামী সংহতি জিগিরের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আপামর জনগণের যে জাগরণ ঘটে তার প্রকৃতি ধর্মনিরপেক্ষ এবং তাদের সেই দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতারই বিজয় সূচীত হয়েছে। সূতরাং ধর্ম নিরপেক্ষতাই হলো বাংলাদেশের অন্যতম মূল চেতনা ও আদর্শ।

ছ) ধর্মনিরপেক্ষতা সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। কেননা ইসলামেও ব্যক্তি বিশেষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জোরজবরদস্তি এবং বাড়াবাড়ি নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

এদিকে যারা ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরোধী তাদের অভিমত হলোঃ[২৭]

ক) প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে যা বোঝায় ইসলাম সে ধরনের কোন ধর্ম নয়। ইসলামের অর্থ শুধু আত্মার আধ্যাত্মিক কল্যাণ নয় বা কতকগুলি শিষ্টাচারের সুমার্জিত নিয়ম পদ্ধতিও নয়। বরঞ্চ ইসলাম হচ্ছে একটি সর্বাঙ্গীন জীবনব্যবস্থা যার মধ্যে একটি সুষম অর্থনৈতিক জীবনাদর্শ, জীবন সম্পর্কে একটি দার্শনিক দৃষ্টিভংগি, রাজনৈতিক বিধি–বিধান, শিক্ষানীতি, দেওয়ানী, ফৌজদারী ও আন্তর্জাতিক আইনবিধি—এ সমস্তই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এসবই ইসলামের ধর্মীয় বিধান ও তার জীবন ধারার অংগ। পাশ্চাত্যে ধর্ম ও রাজনীতির যেরকম আলাদা অবস্থান রয়েছে ইসলামে তা নেই। এখানে ধর্মীয় বিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রকে পরিবেষ্টন করে আছে। কাজেই কোনো অবস্থাতেই এবং কোনো অজুহাতেই রাষ্ট্র পরিচালনাকে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে আলাদা করার কোনো সুযোগ ইসলামী জীবন বিধানে নেই। আর এটি করার অর্থ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী একজন ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস ও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ।

খ) ধর্ম নিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা যদি এই করা হয় যে, অপর ধর্মের প্রতি সহনশীলতা তাহলেও বাংলাদেশে এর প্রয়োজন নেই। কেননা এখানে ইসলামের কথা বলা হচ্ছে এবং

২৭। দেখুন , শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১ পৃঃ ৭১–৮৭, মুহম্মদ কুতুব, *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম*, ঢাকা ঃ বুক ফোরাম, প্রথম সংস্করণ, জুন, ১৯৭৫ ও মহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*, ঢাকা, ১৯৭৭। আরও দেখুন, সাপ্তাহিক মেঘনা, প্রথম বর্ষ সংখ্যা, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৪, *সাপ্তাহিক আগামী*, ঈদ সংখ্যা, ১৩–২৭ এপ্রিল, ১৯৯০।

ইসলাম নিজেই অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল হবার কঠোর তাগিদ দান করে। বাংলাদেশের বাস্তবতাও এটাই যে, এখানে বিগত চৌদ্দ বছর যাবৎ ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় আদর্শ না থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহনশীলতা অটুট রয়েছে। আর ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ করলেই যে ধর্মীয় সমপ্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় তা সত্য নয়। ভারত এবং ব্রিটেনের উদাহরণই তার প্রমান।

গ) একথা ঠিক যে, ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসের বেলায় ইসলাম পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে এবং একজন লোক মুসলিম হবে কি হবে না এটাও তার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। তবে ইসলামে বিশ্বাসী হবার পর একজন ব্যক্তির উপর কিন্তু ইসলাম অনেক কিছুই আরোপ করে এবং আইনানুগ নিয়ন্ত্রণের পুরোটাই রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করে।

ঘ) দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইসলামের দোহাই দিলেও তাদের বাস্তব আচরণ ছিল তার ঠিক উল্টোটা। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর দিয়ে তারা চালিয়েছিল শাসন ও শোষণের ষ্টীম রোলার। একারণেই এদেশের জনগণ পাকিস্তানী শাসক চক্রের ভাওতাবাজি এবং শাসন-শোষণের নাগাল থেকে মুক্ত হবার জন্যে আন্দোলন করেছে এবং পরিশেষে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা মোটেও যথার্থ নয় যে, জনগণ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখানে উল্লেখ্য পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধীকার এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের সত্তরের নির্বাচনী ইশতিহার এবং একাত্তরের মার্চে আওয়ামী লীগের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক তৈরী খসড়া সংবিধানেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রসারের জন্যে তাতে একটি বিশেষ ধারাও সন্নিবেশিত করা হয়। এমনকি একাত্তরে মুজিবনগরে এপ্রিল মাসে গৃহীত বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদেও ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো উল্লেখ ছিল না। কাজেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষে পরিচালিত সংগ্রাম—এ কথা যথার্থ নয়।

ঙ) একাত্তরে কোনো কোনো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতা করে এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে—এ কারণে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক কোন রাজনীতিই এদেশে চলতে পারবে না-এটাও যুক্তিসংগত নয়। কেননা এ সমস্ত ধর্মভিত্তিক দল ছাড়াও কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দল যেমন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাঃ লেঃ) এর দুটো গ্রুপ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে অভিহিত করেছিল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়েছিল। এমনকি স্বাধীনতার পরও দীর্ঘ তিন বছর আবদুল হক এর

নেতৃত্বাধীন কমিউনিষ্ট পার্টির নাম পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাঃ লেঃ) –ই বহাল রাখা হয়। কিন্তু তাই বলে এ যুক্তি তো তোলা হচ্ছে না যে, বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক রাজনীতি কেউ করতে পারবে না। আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা রাখার জন্যে সংশ্লিষ্ট দল বিশেষ বা দল সমূহকেই দায়ী করা উচিত। এ জন্যে কোনো আদর্শকে রাষ্ট্রীয় অংগন থেকে বিদুরিত করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে না।

চ) ইসলামের যেহেতু রয়েছে নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী, কাজেই ধর্মীয় আবেদনের প্রসংগ বাদ দিলেও যদি কেউ অন্যান্য মতবাদের ন্যায় নিছক একটি মতাদর্শ হিসেবেও ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালায় এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তাতে রয়েছে জনগণের মুক্তি, তাহলে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে মতবাদের প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করার সুযোগ নেই। কাজেই ধর্ম নিরপেক্ষতার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী কোনো দলকে রাজনীতির অংগন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অবকাশ কোথায়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, কোনো রাষ্ট্রে আইনানুগ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কেবল ইসলামের পূর্ণাংগ জীবনাদর্শের উপর প্রচন্ড আঘাতই নয় উপরন্ত এটা গণতান্ত্রিক রীতি নীতিরও খেলাফ।

ছ) এমনকি ধর্মীয় আদর্শের অপব্যবহার তথা ধর্ম ব্যবসা বন্ধ করার অজুহাতেও ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করার অবকাশ নেই। কেননা অপব্যবহার কেবল ইসলামী আদর্শেরই হচ্ছে তা–ই নয়, অন্যান্য মতাদর্শেরও অপব্যবহার বাংলাদেশের রাজনীতিতে অহরহ হচ্ছে। যেমন গণতন্ত্রের অপব্যবহার, সমাজতন্ত্রের অপব্যবহার। এমনকি খোদ ধর্মনিরপেক্ষতার অপব্যবহারের নজীরও রাজনীতিতে বর্তমান।

এভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে বিপরীতমূখী মেরুকরণ বাংলাদেশে ঐকমত্যের পথে বিরাট অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা – এ দুয়ের উৎস ও উপাদান ইতিহাসের গভীর মুলে প্রোথিত। অর্থাৎ বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসে এমন সব উপাদান রয়েছে যা এ উভয় ধারাকেই পুষ্ট করেছে। ধরা যাক বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও প্রসারের কথা । ঐতিহাসিকদের মতে, ইসলাম বাংলাদেশ ও তার জনগণের সামনে দিগ্বিজয়ীর বেশে আসেনি–আসেনি তার পূর্ণাংগ রূপ নিয়ে। অষ্টম শতাব্দীতে এখানে প্রথম ইসলাম প্রচারিত হয় সুফী দরবেশ আওলিয়া ও আরব বণিকদের মাধ্যমে। সুফী দর্শনের একটি অন্যতম প্রধান সুর হলো জীবনের নানাবিধ জটিলতা থেকে নিজেদেরকে যথাসম্ভব মুক্ত রেখে আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করা।

সুফী দরবেশদের দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হওয়ায় এখানকার জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনায় মরমীবাদ বেশ ক্রিয়াশীল দেখা যায়। প্রসংগত উল্লেখ্য কেউ কেউ এখানে ভূলক্রমে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়কে এদেশে ইসলাম প্রসারের প্রথম অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি বাংলা জয় করবার বহু আগেই ইসলাম বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে জনগণের ধর্মে পরিণত হয়।[২৮] আর বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির রূপও ইসলামের সনাতন ও পূর্নাংগ রূপ ছিলনা– এটা ছিল পাঠানী ও মোগলাই রূপ। এজন্যে বাংলাদেশে ইসলাম যে রূপ গ্রহণ করে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে বলেছেন 'বংগের লৌকিক ইসলাম'।[২৯] সাহিত্যিক এনামূল হক লিখেছেন "যেহেতু কোনো বাংগালী শাস্ত্রীয় ইসলামের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করে বাংলাদেশের মাটিতে তা প্রচার করেননি, তার ফলে ইসলাম বাংগালীদের মধ্যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়"।[৩০] অপর একজন গবেষকও উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে "অবিকৃত মূল ইসলাম ব্যাপকতা লাভ করেনি "[৩১]।

বস্তুত আরব ইরান উত্তর ভারতের আঁকাবাকা পথ বেয়ে অনেকটা পরিবর্তিত রূপ নিয়ে ইসলাম বাংলায় পৌছেছিল, পার্শ্ববর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধদের অনেক বিশ্বাস ও আচরণও মুলসমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। উনিশ শতকের ওহাবী আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত এই সব অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচরণ–ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় শিরক ও বিদআৎ–দূর করবার কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস এবং জীবন আচরণে তাই শরীয়তী ইসলামের পরিপন্থী অনেক বিষয় অনুষংগ হিসেবে দেখা যায়। বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগেষ্ঠীর একাংশের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা বৃটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত পাশ্চাত্যের শিক্ষাপদ্ধতি ও সংস্কৃতির প্রসারের ফল। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন যদিও ধর্মীয় চেতনামিশ্রিত ছিল তথাপি তারও মূল সূর এবং বাস্তব প্রতিফলন ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকেই প্রসারিত করে। বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সংগঠিত প্রয়াসও এক্ষেত্রে অবদান রাখে। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানী শাসকচক্রের ধর্মীয় শ্লোগান মিশ্রিত গণবিরোধী নীতির প্রেক্ষিতে গণমনে ধুমায়িত অসন্তোষ, বামরাজনীতির প্রসার এবং

২৮। আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*,ঢাকা ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৫।

২৯। দেখুন, আবুল কাশেম ফজলুল হক, 'বাংগালী জাতি', দ্রষ্টব্য, *বাংলাদেশ* (সম্পাদনায়) মনসুর মুসা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪ পৃ ঃ ৫৯– ১০৮।

৩০। উদ্ধৃত, ঐ।

৩১। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'বাংলাদেশ ঃ প্রসংগ উত্তরাধিকার', *ঐতিহ্য সংস্কৃতি সাহিত্য* (মাহমুদ শাহ কোরেশী সম্পাদিত) আই, বি, এস সেমিনার, ভল্যুম–৩, ১৯৭৯, পৃঃ ২৪।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের বিরোধী ভূমিকা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে অধিকতর প্রাণসঞ্চার করে।

অপরদিকে বিভিন্ন উপাদান বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংগনে ইসলামের আবেদন ও অবস্থানকে সংহত করে। যেমন প্রথমদিকে যদিও সুফী আওলিয়াদের দ্বারা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয় এবং কোনো ধরনের রাজ্যবিজয় তাদের উদ্দেশ্য ছিল না তথাপি তাদের প্রচেষ্টায় যখন দলে দলে লোক ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে তখন তৎকালীন কায়েমী স্বার্থের গায়ে তাতে লাগে প্রচন্ড আঘাত। তার ফলে তারা নানা জায়গায় ইসলাম প্রচারে বাধা দিয়েছিল। তাতে কোথাও কোথাও ছোট বড় সংঘাত হয়েছে। বৃহত্তর সিলেটে গৌগোবিন্দের বিরুদ্ধে শাহজালালের, কিংবা বগুড়া জেলার মহাস্থানের পরশুরাম রাজার সংগে শাহসুলতান বলখীর যুদ্ধ ছাড়াও এই ধরনের আরো অনেক সংঘাতের কথা জানা যায়। বাংলাদেশের নানা স্থানে এ ধরনের সংঘাতের অনেক কাহিনী আজও লোকমুখে প্রচলিত আছে। একজন লেখক লিখেছেন, 'বাংলাদেশে যখন ইসলাম প্রচারিত হয় তখন এই অঞ্চল তান্ত্রিকতায় ভরপুর ছিল। এই তান্ত্রিকদের সংগেও ইসলাম প্রচারকদের ভীষণ সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তান্ত্রিকতার ধারা বিলুপ্ত হয়। অপেক্ষাকৃত পরে উদ্ভূত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের সংগেও মুসলমানদের অনেক বিরোধ ঘটে। বৈষ্ণব ধর্ম ছিল প্রকৃতপক্ষে ইসলামের গ্রাস থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করারই একটি প্রয়াস। বলা বাহুল্য ইসলাম এসেছিল বাংলার তৎকালীন নিপীড়িত জনগণের ধর্ম হিসেবে। তৎকালীন শাসক-শোষকদের ধর্ম ও আদর্শের সংগে বিরোধের মধ্যে দিয়েই তা আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের তথা শোষিত জনসাধারণই ব্যাপকভাবে ইসলামে আকৃষ্ট হয়েছিল ও ইসলাম গ্রহণ করেছিল'।[৩২] এভাবে শুরুতেই ইসলাম এখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্যায়- অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মন্ত্র হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং সেই থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক বিবর্তন ও রাজনৈতিক মানসিকতায় এবং তাদের ইতিহাসের উত্থান-পতনে ইসলাম বরাবরই ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

উইলিয়াম হান্টারের লেখা থেকে জানা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সময়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যখন মুসলমানরা সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন বাংলাদেশের ধর্মীয় আলেমরা তাকে 'জিহাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করে মুসলমানদেরকে তাতে অংশগ্রহণের আহবান জানান এবং

৩২। আবুল কাশেম ফজলুল হক, 'বাংগালী জাতি,' মনসুর মুশা সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত* পৃঃ ৮২

বাংলার মুসলমানদের অনেকে নিজেদের সংগৃহীত অর্থ সহ দুই হাজার মাইল দুরের সেই জেহাদে গিয়ে শরিক হোন।[৩৩] পরবর্তী সময়ে খেলাফত আন্দোলন-এর সময়েও তুরস্কের খেলাফত রক্ষার জন্যে এবং বৃটিশ বিরোধী অন্যান্য আন্দোলনে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে একই প্রেরণা ও সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। সাতচল্লিশ সালে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশের মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের মুসলমানগণ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যদিও পরবর্তী সময়ে এটা তাদের জন্যে বঞ্চনা ও তিক্ততার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব সত্বেও এবং রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পরেও কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও উদ্দীপনা এতোটুকু কমেনি বরং ক্রমশঃ উদ্দীপিত হচ্ছে।[৩৪] যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রশ্নে তাদেরকে মূহুর্তের মধ্যে Militant রূপ ধারন করতে দেখা যায়।

তাছাড়া সমসাময়িক কালে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী পূনর্জাগরণ প্রয়াস, বিভিন্ন চিন্তাবিদের লেখনী, শীর্ষস্থানীয় আলেমদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংগঠন ও তার টিকে থাকা, মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ, ভারতের মোকাবেলায় বাংলাদেশের কৌশলগত অসুবিধাজনক অবস্থান, এবং স্বাধীনতোত্তরকালে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় আবেদনকে সতেজতা ও পরিপুষ্টি দান করেছে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের বিশেষ করে ইসলামের ভূমিকা প্রশ্নে উপরোক্ত দুটো বিপরীতমূখী প্রবণতা তথা মেরুকরণ ছাড়াও মধ্যবর্তী আর একটি প্রবনতা তথা দৃষ্টিভংগি বিরাজমান রয়েছে যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। একজন বিশ্লেষক তাদেরকে বৃহৎ (Larger zone) ও গণতন্ত্রমনা গ্রুপ হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৩৫] এরা পাকিস্তান আমলের শাসকবর্গের ন্যায় ধর্মকে শোষণের ও ব্যবসায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের যেমন বিরোধী তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ন্যায় ধর্মীয় রাজনীতি মাত্রই একেবারে নিষিদ্ধ করতে হবে—এ নীতিরও বিরোধী। তারা বাংলাদেশকে পুরোপুরি ইসলামী প্রজাতন্ত্র করার যেমন পক্ষপাতী নন তেমনি এটাকে একটি আইনানুগ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণারও বিরোধী। তাদের মতে উভয়টিই প্রান্তিক ও চরম এবং বাংলাদেশের সমাজের জন্যে তা অনুপযোগী। এ সবের প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে

৩৩। উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্,* আনিসুজ্জামান অনূদিত।

৩৪। দেখুন, K. M. Mohsin, " Trends of Islam in Bangladesh" in Rafiuddin Ahmed, op cit., pp. 226-249.

৩৫। Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh Politics : Secular and Islamic Trends" in Rafiuddin Ahmed, *op. cit.*, p. 217.

অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ধর্মের ভূমিকা প্রশ্নে বিরাজমান উপরোক্ত তিন গ্রুপের মতামত তথা ত্রিমুখী মেরুকরণও কিন্তু জাতীয় জীবনে সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতারই ইংগিতবাহী।

জাতীয় জীবনে সামাজিক শক্তিসমূহের অবস্থান ও ভূমিকা

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাভিত্তিক গ্রুপসমূহের 'যথাযথ' ভূমিকা ও অবস্থান কি হওয়া উচিৎ —তা নিয়েও সাম্প্রতিক কালে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক দল, বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা বিরোধ ও ভারসাম্যহীনতা বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে।[৩৬] কারো কারো মতে একারণেই দেশে বার বার সামরিক শাসন এসেছে, দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্ষুন্ন হয়েছে। এদিকে কিছুকাল যাবত দেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদে পেশাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব দাবী করে আসছে। ১৯৮২ সালে ক্ষমতায় আসার আগে এবং পরে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান জেনারেল এরশাদ জাতিগঠন কার্যক্রম এবং জাতীয় নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর অংশ গ্রহণের সুযোগ এবং অধিকারের প্রশ্নটি একাধিক বার গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন।[৩৭] ১৯৮৭ সালে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে পুণগঠিত জেলা পরিষদে সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ সম্বলিত একটি বিল পাশের পর এ বিতর্ক তুংগে উঠে। পরিস্থিতি এতোটা প্রান্তিকতার দিকে মোড় নেয় যে, কেবল প্রশাসন ও রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়েই নয় বরং বাংলাদেশে কনভেনশনাল সশস্ত্র বাহিনীর আয়তন ও গঠন নিয়েও বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত হতে থাকে। প্রেসিডেন্ট অবশ্য পরে এ বিলে আর স্বাক্ষর করেননি। বর্তমানে দেশের সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ভাবে নিম্নোক্ত মতামত সমূহ বিরাজ করছে।

(১) বাংলাদেশে একটি বিরাট ও স্থায়ী সেনাবাহিনী থাকা দরকার। সেনাবাহিনীর ভূমিকা শুধু দেশের প্রতিরক্ষায়ই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তারা রাজনীতি ও বেসামরিক প্রশাসনসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে। আমাদের সেনাবাহিনী দেশের সবচেয়ে শৃংখলাবদ্ধ ও ঐক্যসাধনের শক্তি। তারা দক্ষ এবং দেশ

৩৬। দেখুন, Abul Fazal Huq, " Bangladesh : Constitution, Politics and Bureaucracy". The Rajshahi University Studies, part-A, Vol.. XI 1980-83, p. 200-216,

৩৭। দেখুন, Iftekharuzzaman and Mahbubur Rahman, " Nation Building in Bangladesh : Perceptions, Problems and An Approach", in M. Abdul Hafiz and Abdur Rob Khan (eds), *Nation Building in Bangladesh : Retrospect and Prospect,* BIISS, 1986, pp. 28-36.

গঠনে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শক্তি। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে এরা ঔপনিবেশিক ও ভাড়াটে সৈন্যের চরিত্র সম্পন্ন নয়।

(২) বাংলাদেশে নামে মাত্র সেনাবাহিনী থাকা দরকার। যেহেতু ভারত দেশের তিন দিক ঘিরে রয়েছে সেজন্য বাংলাদেশের নিরাপত্তা একটি বিরাট ও স্থায়ী সেনাবাহিনী দ্বারাও সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং ভারতের সংগে সম্ভব ও বন্ধুত্ব রেখেই তা নিশ্চিত করা সম্ভব। তাছাড়া বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র রাষ্ট্র যার সমস্ত সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করা সবচেয়ে জরুরী তার পক্ষে একটি বিরাট স্থায়ী সেনাবাহিনী পোষা অর্থনৈতিক ভাবে সম্ভব নয়। তাই শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন ও সংকীর্ণ প্রতিরক্ষা কর্মসূচী ছাড়া সশস্ত্র বাহিনী থাকার কোন দরকার নেই। আর প্রশাসন ও রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর কোন ভূমিকা থাকারতো প্রশ্নই উঠে না।

(৩) বাংলাদেশের একটি বিরাট সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই এবং তা পোষার সামর্থ্যও নেই। দেশ পরিচালনার প্রাত্যহিক কাজেও সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ মোটেই বাঞ্চিত নয়। তাদেরকে অবশ্যই গণতান্ত্রীক পদ্ধতিতে গঠিত বেসামরিক সরকারের পুরোপুরি অধীনস্ত থাকতে হবে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, দেশকে সেনাবাহিনী মুক্ত করতে হবে, এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভারতের সাথে সম্ভাব্য বন্ধুত্বের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। বাংলাদেশের ভৌগলিক ও কৌশলগত অবস্থান এটাই দাবী করে যে, জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশের একটি ছোট অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী উচ্চমানের পেশাজীবী সেনাবাহিনী থাকা দরকার। প্রয়োজনে দেশের সকল সক্ষম নাগরিককে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যেন বহিঃ শত্রুর আক্রমণের সময় অতি দ্রুত দেশব্যাপী একটা জনগণের সেনাবাহিনী (citizen army) গড়ে উঠতে পারে।[৩৮]

উপরের এক নম্বর এবং দুই নম্বর বক্তব্যটি একে অপরের ঠিক বিপরীত এবং প্রান্তিকধর্মী বলে তিন নম্বর মত পোষণকারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এক নম্বর বক্তব্যের প্রবক্তা বর্তমান সরকার নিজেই। তাদের কার্যক্রম তাই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির চোখে সামরিকীকরণ (Militarization) প্রক্রিয়া হিসেবেও সমালোচিত হতে থাকে। সত্য বলতে কি জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসার আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন 'আমাদের সমাজে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণের জন্য সংবিধানে বিধান রাখতে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে।'[৩৯] তার বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ ঃ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী

৩৮। আসহাবুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও অন্যান্য প্রবন্ধ*,ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি লিঃ, ১৯৮৭, পৃঃ ১২০-১২১।

৩৯। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮১, পৃঃ ১১।

যারা দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল পেশাজীবীদের অংশগ্রহনের কথা বলছেন তাদের অভিমতও সমালোচিত হচ্ছে। যেমন প্রশ্ন এসেছে পেশার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং সর্বসম্মত শ্রেণী বিন্যাস কি করে হবে? তার পর পেশাজীবীদের আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং কোন পেশা থেকে কত জন সদস্য নেয়া হবে এ প্রশ্নের উত্তর কে নির্ধারণ করবে? তাছাড়া বিশেষ কোন পেশাজীবী গ্রুপ যেমন সশস্ত্র বাহিনীকে 'ওয়েটেজ' অর্থাৎ সংখ্যানুপাতিক হারের চাইতে বেশী দিতে গেলে অন্যান্য পেশার লোকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে তারই পরিনতি কি ভালো হবে? এর উপর আরো প্রশ্নঃ যদি ধরেও নেয়া যায় এর যে পার্লামেন্টে সশস্ত্র বাহিনীর অংশ গ্রহণ থাকবে তাহলে প্রতিনিধি কিভাবে নির্ধারণ করা হবে—নির্বাচন নাকি বাছাইয়ের মাধ্যমে। নির্বাচন হোক, আর বাছাই হোক তারই বা পদ্ধতি কি হবে? আর এ সব করতে গেলে সশস্ত্র বাহিনীর আভ্যন্তরীণ পরিবেশ, নৈতিক শক্তি, দক্ষতা, শৃংখলা ও পেশাগত চরিত্র কি মারাত্মকভাবে ধ্বংস হবেনা?

বাংলাদেশের ন্যায় বহুদলীয় ধনতান্ত্রিক সমাজে সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত না করার তাগিদ দিয়ে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবল মাত্র সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একদলীয় রাষ্ট্র–ব্যবস্থাতেই সশস্ত্র বাহিনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ফলপ্রসু ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।[৪১] উদাহরণ স্বরূপ তারা উল্লেখ করেছেন যে, গণচীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সশস্ত্র বাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের উপর কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিরাজমান। কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য এবং আদর্শের চাহিদা পুরণের উদ্দেশ্যেই সশস্ত্র বাহিনী এবং আমলাতন্ত্র বিদ্যমান ও সক্রিয় থাকে—পার্টির রাজনৈতিক আদর্শ বহির্ভূত অন্য কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য পোষণ করার অবকাশ তাদের নেই। মূলত: সেখানে তিনটি প্রতিষ্ঠানই, রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনী এবং আমলাতন্ত্র অভিন্ন এবং একই লক্ষ্যে নিয়োজিত ও নিবেদিত, সমাজতান্ত্রিক দেশ সমুহের সশস্ত্র বাহিনীর এই লক্ষ্য, প্রকৃতি ও আচরণ কিন্ত ধনতান্ত্রিক বহুদলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এখানে সমস্ত বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং জীবন যাত্রা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত—সৈনিকরা ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করতে পারে (যা সমাজতান্ত্রিক দেশে অচিন্ত্যনীয়)। এ ব্যবস্থায় সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ 'নিরপেক্ষ গোষ্ঠী' হিসেবে বিরাজ করে, যার দায়িত্ব হচ্ছে বিনা প্রশ্নে (আমলাতন্ত্রের ন্যায়) প্রতিষ্ঠিত সরকারের (অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায়

৪১। Azizul Huq, *Multi-party System and the Defence Forces—A Discussion,* Dhaka : Centre For Administrative Studies, 1985.

অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর মতো নয়। এই বাহিনী জনগণের পাশে থেকে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। তাই আমাদের জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ঔপনিবেশিক সশস্ত্র বাহিনী নয়— বরং তা সত্যিকার অর্থে জনগণেরই সশস্ত্র বাহিনী। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে সমাজ ও সমাজের ঘটনাবলীর আবর্তে থেকে আমাদের সৈনিকদের দুরে সরিয়ে রাখতে কেউ সফল হয়নি। তা করা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে সামরিক বাহিনীকে নিছক একটা সার্ভিস বলে গণ্য করা চলে না। এটা তার চেয়েও অনেক বেশী কিছু আমাদের মতো গরীব দেশে এমন চমৎকার বাহিনীর শক্তিকে দেশরক্ষার ভূমিকা পালন ছাড়াও উৎপাদনমূলক এবং জাতি গঠনমূলক কাজে ফলপ্রসুভাবে কাজে লাগানো সম্ভব । সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত পশ্চিমী ধ্যান–ধারণা থেকে আমাদের দুরে সরে থাকতে হবে। জাতি গঠন এবং দেশরক্ষা এ দুই ভুমিকাকে সার্বিক জাতীয় প্রতিরক্ষার একটি মাত্র ধারণায় একীভুত করতে হবে।

আমাদের সীমান্ত রক্ষায় সক্ষম একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হলে আমাদের হাজার হাজার সুশিক্ষিত সৈনিকের প্রয়োজন। আমরা কতোদিন ধরে তাদের ট্রেনিং দেব ? বেশ কয়েক বছর ধরে। ট্রেনিং শেষ হলে আমরা তাদের নিয়ে কি করবো ? ব্যারাকে বসিয়ে রাখবো ? না তা করবো না। আমরা তখন জাতি গঠন কাজে তাদেরকে কার্যকরভাবে নিয়োগ করতে পারবো। ট্রেনিং পাবার পর কয়েক বছর তারা সশস্ত্র বাহিনীতে থাকবে। তারপর বেসামরিক দায়িত্বে বা চাকুরীতে নিয়োজিত হবে। এই ভাবে কয়েক বছরে বস্তুতপক্ষে জীবনের সর্বস্তরে আমরা পাবো আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিরক্ষায় অংশ নেবার মত পর্যাপ্ত সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকজনকে। এই করে প্রয়োজনীয় মুহুর্তে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত না করে আমরা জাতীয় প্রতিরক্ষায় সামগ্রিক জাতীয় উদ্যোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। সামরিক লোকেরা বেসামরিক চাকুরীগুলো নিয়ে নিচ্ছে এ ধরনের কথাবার্তা তাই নিতান্তই বাজে। জাতীয় সামরিক বাহিনীর এই মতবাদ অনুযায়ী যেহেতু শারীরিক দিক দিয়ে সক্ষম অধিকাংশ মানুষই সৈনিক হয়ে উঠবেন তাই সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। কিংবা থাকলেও তা খুবই তুচ্ছ।[৪০]

এ বক্তব্যের যারা বিরোধী তাদের এ সম্পর্কে অভিমত হলো, স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনী ছাড়াও সমাজের অন্যান্য গ্রুপ অংশগ্রহণ করেছিল। কাজেই এ যুক্তিতে বিশেষ একটি পেশাজীবী গোষ্ঠীকে সমাজে বিশিষ্ট স্থান দেয়া যেতে পারে না। প্রসংগত

৪০। ঐ

অধিষ্ঠিত দলের আদেশ নির্দেশ পালন করা। এখানে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থক ও জিম্মাদার। এ অবস্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যে কোন দলের দায়িত্ব হলো সামরিক বাহিনীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। এই পরিস্থিতিতে সব দল থেকে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়া থেকে) সামরিক বাহিনীর সমদূরত্বে অবস্থান করা স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ সামরিক বাহিনী সব দলের প্রতি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করবে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় এর বিচ্যুতি সংকট ও সমস্যা সৃষ্টি করে। বহুদলীয় রাজনীতি মূলতঃ বিতর্কমূলক। অতএব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ একে অবশ্যই একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে এবং এটা তার ভাবমূর্তি, কাঠামোগত শৃংখলা ও ঐক্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। রাজনৈতিক বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ায় সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে তার (পূর্বেকার) জাতীয় ঐক্য প্রতীকের চরিত্র হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা বেশী। উপরন্ত এ পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর কোন প্রভাবশালী গুরুত্বপূর্ণ অংশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি ও ক্ষমতাসীন দলের দৃষ্টিভংগি পরস্পর বিরোধী হলে ওই অংশ সামরিক হস্তক্ষেপে সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করতে (অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে একচেটিয়া সুযোগের দরুন) অনুপ্রাণিত হতে পারে।

সশস্ত্র বাহিনীর শাসনতান্ত্রিক ভূমিকা বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার এক বড় রক্ষাকবচ—এ যুক্তিটিও অনেক বিশ্লেষক এই বলে খন্ডন করেছেন যে, ইতিহাস বা উদাহরণে এ যুক্তি টিকে না। তারা উল্লেখ করেছেন যে পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধানে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে ২০ বছর পর্যন্ত দেশরক্ষা মন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনী থেকে (কমপক্ষে লেঃ জেনারেল পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি) নিযুক্ত হবে (২৩৮ ধারা)। তুরস্কের সংবিধান (১৯৬৩ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর) সশস্ত্র বাহিনীর রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু এ সব সত্বেও পাকিস্তান এবং তুরস্ক পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থানের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বরং স্থিতিশীলতা অর্জন দূরে থাকুক পাকিস্তানে সামরিক শাসনের ফল যে কি হয়েছিল তা সকলের জানা। সামরিক শাসন তাদের দেশ বিভক্তিকে ত্বরান্বিত করেছিল। সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনা শক্তিকে জোরদার করেছে। লাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার অনেক দেশ আছে যেখানে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক/ শাসনতান্ত্রিক ভুমিকা স্বীকৃত অথবা সামরিক বাহিনী বহুদিন ধরে ক্ষমতায় আছে। তবুও সে সব দেশে স্থিতিশীলতার পরিবর্তে সামরিক অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলছে।

মোটকথা, বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে সাধারণভাবে সামাজিক ও পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী সমূহের ভুমিকা এবং বিশেষভাবে সামরিক বাহিনীর অবস্থান ও ভুমিকার প্রশ্নটি

আজো অব্যাহত বিতর্কের মধ্য দিয়েই চলছে। প্রশ্ন হচ্ছে বিষয়টা এতোটা জটিল হবার কারণ কি? এর সমাধান কি একেবারেই সুদুর পরাহত? একজন বিশ্লেষক লিখেছেন 'জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ঐতিহাসিক বিকাশ অধিকাংশ দেশে যেভাবে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্র পরিচালনার ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে তার থেকে অচিরেই মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা খুব কম দেশেরই বিদ্যমান। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পরিবেশে এর থেকে মুক্ত হওয়ার একটা পথ হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতাদর্শগত দিকদর্শন সম্পন্ন গতিশীল নেতৃত্বের আবির্ভাব, রাজনৈতিক সংগঠনের কাঠামোগত পরিবর্তন এবং বিকাশ, একই স্বার্থ সম্পন্ন গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থভিত্তিক সংগঠন, প্রচার মাধ্যমের উন্নয়ন ও প্রসার, জনগণের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। কিন্তু এ সবের পুরণ সুদুর পরাহত। মুক্তির আর একটা পথ হচ্ছে যথাবিধি সামরিক বাহিনী এবং সরকারী চাকুরিজীবীদের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটা আবার প্রশাসনিক কারণে অসম্ভব। আর একটা উপায় হচ্ছে সনাতন পেশাদার সামরিক বাহিনীর উচ্ছেদ এবং দক্ষ গণবাহিনীর (মিলিশিয়া) মাধ্যমে নতুন দেশ রক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন। সকল দেশে এটা সম্ভব নয়, যুক্তি সঙ্গতও নয়। তাছাড়া এর আবশ্যিক শর্ত হিসেবে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সংগঠন ও মতাদর্শগত দিকদর্শনের প্রয়োজন তা এসব দেশে বিরল। আর তা বিদ্যমান থাকলে সনাতন সামরিক বাহিনীর উচ্ছেদ অনাবশ্যক। স্মরণ রাখতে হবে যে, সাধারণ পরিস্থিতিতে কেবল গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন রাজনৈতিকভাবে সুসংবদ্ধ জনতার লৌহকঠিন গণতান্ত্রিক পরিবেশই পেশাগতভাবে সুদক্ষ ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনী পোষণ করতে পারে। পেশাদার গতিশীল বাহিনী হিসেবে তাকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি বহির্ভূত রাখতে পারে'।[৪২] অথচ এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিরাজ করছে উভয় সংকট। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, একদিকে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের শক্তি ও কৌশলগত উচ্চাকাংখার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত নিরাপত্তার প্রশ্নে (threat perception) বাংলাদেশে যেমন একটি দক্ষ পেশাগত সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারে না তেমনি রয়েছে তার নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতিক উপসর্গসমুহ। এই dilemma বা দ্বন্দ্বই বাংলাদেশে বেসামরিক কতৃত্ব (Civilian supremacy) প্রতিষ্ঠার পথে বড় অন্তরায় এবং অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এটাই আজকের বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং জাতি গঠনের পথেও অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

৪২। আখলাকুর রহমান, 'তৃতীয় বিশ্বের বিকাশশীল দেশগুলোতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা', *ত্রৈমাসিক উন্নয়ন বিতর্ক*, মার্চ ১৯৮২। ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, 'সেনাবাহিনীর রাজনীতিঃ কেন্দ্রীয় ইস্যু', *বিতর্ক-১*, মার্চ ১৯৮৭।

জাতীয় নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্ক

জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে – এমন বিষয় সমুহ চিহ্নিত করা এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মিত্র বাছাই এবং যথাযথ কৌশল নির্ধারণ করাও জাতিগঠন কার্যক্রমের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এসর্ম্পকেও জাতীয় ঐকমত্য গঠন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে এক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে তা নিম্নরূপ। প্রথমতঃ এখানে জাতীয় নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তেমন গুরুত্বের সংগে কোন আলোচনাই হয়নি বলা চলে। জাতীয় নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন কাঠামোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যেই মুলতঃ এটা সীমাবদ্ধ রয়েছে। ফলে নিরাপত্তার ধারণা নিয়েই শিক্ষিত জনগেষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অস্পষ্টতা এবং বিভ্রান্তি। কেউ কেউ মনে করেন, জাতীয় নিরাপত্তা নিছক সামরিক শক্তির ব্যাপার এবং নিরাপত্তাহীনতা বলতে কেবলমাত্র ভৌগলিক আগ্রাসনের হুমকি উদ্ভুত নিরাপত্তাহীনতাই বোঝায়। কেউ কেউ আবার এমন অভিমতও পোষন করেন যা একেবারে ভ্রান্ত না হলেও অপূর্ণাংগ। বস্তুত নিরাপত্তাহীনতার উৎস এবং উপাদানের রয়েছে দুটো দিক। একটি তার আভ্যন্তরীণ দিক (Internal sources and factors) এবং অপরটি হচ্ছে বাইরের (External sources and factors) ।[৪৩] আভ্যন্তরীণ দিক থেকে একটি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দুর্বলতা, জাতিগত সংঘাত এবং সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা সে দেশের জন্য নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও রাজনেতিক ভাবে অস্থিতিশীল দেশসমুহের জন্যে আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাপনা (domestic home) management কে তাই তাদের নিরাপত্তা রক্ষার অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এখন নিরাপত্তা সম্পর্কে যিনি সনাতন ধারণা নিয়ে বসে আছেন তিনি নিরাপত্তাহীনতার এই বিশেষ (অভ্যন্তরীন) উৎস সম্পর্কে অজ্ঞাত এবং অনবহিত থাকবেন–এটাই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা এবং কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এসমস্যাটি প্রত্যক্ষ করা যায়। তাইতো এখানে এ অভিযোগও শুনতে পাওয়া যায় য়ে, জনমতের প্রতি তোয়াক্কাহীন বলপ্রয়োগ সর্বস্ব রাজনৈতিক পদ্ধতি ও কাঠামো চালু রাখা, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর

৪৩। M. Abdul Hafiz and Abdur Rob Khan (eds.), *The Security of Small States,* Dhaka : UPL, 1987; M. Abdul Hafiz, "National Security and Small States : A Third World Perspective" *BIISS Journal,* Vol. 7, No. 3, 1986.

অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল অবলম্বন এবং সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিপুর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ নিরাপত্তাহীনতার এ বিশেষ দিক নিয়ে তেমন বিচলিত নন। এমনকি এটা যে নিরাপত্তাহীনতার উৎস হতে পারে সে সম্পর্কে তারা ধারণা পর্যন্ত রাখেন না।

এদিকে বাইর থেকেও (Externally) আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ঠিক কোন্ কোন্ দিক থেকে কিভাবে হুমকির সম্মূখীন হতে পারে সে সম্পর্কেও রয়েছে বিস্তর মতবিরোধ। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তাদের পরিচালিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সাহায্যকারী সংস্থা সমূহ(NGO) বহুজাতিক কর্পোরেশন সমূহের তৎপরতা এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতাকে এখানে কেউ কেউ জাতীয় নিরাপত্তাহীনতার প্রতি ভবিষ্যৎ হুমকি হিসাবে গন্য করেন। কেউবা আবার রাশিয়া ও ভারতকে আমাদের নিরাপত্তার পথে প্রধান হুমকি হিসাবে গণ্য করেন। ভারত সম্পর্কে কেউ কউ মনে করেন যে, ভারত হয়তো বাংলাদেশকে ভৌগলিকভাবে গ্রাস করবেনা, তবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে এদেশকে কোণঠাসা করে রেখে ভারত এদেশের উপর তার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করবে। পাকিস্তানের দিক থেকেও কেউ কেউ আবার আমাদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি অনুভব করেন, যেমন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী শক্তি সমূহের দ্বারা ভবিষ্যতে হয়তো পাকিস্তানের সাথে 'কনফেডারেশন' জাতীয় কিছু একটা করার ষড়যন্ত্র হতে পারে।

এভাবে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি বর্তমান বা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে দেশে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভংগী (perception) বিরাজ করছে। উল্লেখ্য জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি বাইরের হুমকি নিয়ে এধরনের বিভিন্ন ধারণা ও মতামতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে বিষয়টি (কারো কারো মতে, সম্ভাব্য প্রধান হুমকি) তা হচ্ছে আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের অবস্থান ও তার ভুমিকা। ভারতকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য নিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণ ও উৎস (potential threat to our security) হিসেবে বিবেচনা করার পেছনে যে বিষয়গুলো কাজ করে তা হলো ঃ

(১) দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের একক প্রাধান্য ও আধিপত্য এবং ভূ-কৌশলগত (geo-strategic) দিক থেকে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের অসুবিধাজনক অবস্থান।

(২) বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়ন এবং

(৩) প্রতিবেশী দেশসমুহের সাথে ভারতের আধিপত্যসুলভ আচরণ। নিম্নে বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হলো।

অবস্থানগত দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়া মূলতঃ ভারতকেন্দ্রিক (Indo-centric)। এ অঞ্চলের প্রতিবেশী অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় ভারতের অবস্থান সবচেয়ে বেশী সুবিধাজনক পর্যায়ে। দক্ষিণ এশিয়ার মোট অঞ্চলের শতকরা ৭২ ভাগ একা ভারতের দখলে। জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ এবং মোট জি, এন, পির মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগই ভারতের। তাছাড়া অন্যান্য যে সব প্রাকৃতিক উপাদান একটি রাষ্ট্রকে শক্তি দান করে তার সবই ভারতের রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল রাষ্ট্র একত্রে মিলে যে আকার এবং শক্তির অধিকারী ভারত একাই তার কয়েক গুণ। এমনকি সমগ্র বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় ১২টি অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ভারতের রয়েছে চতুর্থ সর্ববৃহৎ সামরিক বাহিনী। এই একক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলে তার প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে– এটাই স্বাভাবিক। তবে তার সাথে যোগ হয়েছে আরও কিছু উপাদান। যেমন দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা সম্পর্কে ভারতের রয়েছে নিজস্ব একটা দৃষ্টিভংগী। ভারতের এ ধারণা অনুসারে পুরো দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে 'একক কৌশলগত ইউনিট' গড়ে উঠবে এবং এখানকার কোন রাষ্ট্র নিরাপত্তা কিংবা অন্য কোন কারণে অঞ্চল বহির্ভূত (Extra-regional) কোন শক্তিকে আহবান জানাতে পারবেনা কিংবা তার সাথে কোন কৌশলগত ঐক্য গড়ে তুলতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী দেশসমুহের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে ভারত তার কর্তৃত্বসুলভ এবং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার অভিভাবক সুলভ আচরণ প্রদর্শনের যে অভিলাষ পোষণ করে তাকে অধিকতর নিশ্চিত ও অক্ষুন্ন রাখার জন্যেই এই 'strategic unity in the region' এর ধারণা সে উপস্থাপন করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা কৌশল সম্পর্কে ভারতের এহেন পরিকল্পনাই তাই প্রতিবেশী দেশসমুহের জন্যে নিরাপত্তার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন বিশ্লেষকের ভাষায়ঃ One of the biggest dilemmas of South Asian politics is that India conceives of her neighbouring countries as lying within the defence peremeter and being integral to the securuty of India, while India's neighbours themselves regard India itself as the source of their insecurity against whom it is necessary to organize their own security interests, sometimes on an extra-regional basis.[৪৪]

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্পর্কে ভারতের নিজস্ব দৃষ্টিভংগী (যা ভারতীয় বিশ্লেষকদের ভাষায়ই Indian Doctrine of Regional Security নামে পরিচিত) ছাড়াও প্রতিবেশী দেশসমুহের সাথে বিরোধপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির

৪৪। Shelton Kodikara, *Strategic Factors in Inter-State Relations in South Asia*, Canberra Papers on Strategy and Defence, No. 19, Canberra, 1979.

ব্যাপারে ভারতের চাপ প্রয়োগ ও বল প্রয়োগের যে নীতি অব্যাহত রয়েছে তা–ও প্রতিবেশী দেশসমুহের জন্যে নিরাপত্তার হুমকি বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথেই ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বেশ তিক্ততাপূর্ণ এবং ভারতের কাছ থেকে তারা চাপের সম্মুখীন।

দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক নিরাপত্তা সম্পর্কে এবং প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রশ্নে ভারতের মনোভাব ও ভূমিকা যা এতোক্ষণ আলোচনা করা হলো সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এবং ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন যাবত যে টানাপোড়ন চলছে তাতে কেউ কেউ ভারতকে বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে সম্ভাব্য প্রধান হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্কের গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার আগেই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি ভারত তার সাহায্য–সহযোগিতা প্রসারিত করে। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর নৃশংস হামলার মুখে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ একাত্তর সালে যখন আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতে, নয়াদিল্লী সরকার তখন সমর্থন দিয়ে, অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সহযোগিতা করে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ কমাণ্ড গঠন করে বাংলাদেশের মাটিতে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে। ভারতের কাছে বাংলাদেশের জনগণের কৃতজ্ঞতা তাই অপরিসীম। কিন্তু একথাও সত্য এবং এটা দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবদান দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত অবস্থানকে অধিকতর সুবিধাজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ারই প্রয়াস ছিল। একজন বিশ্লেষকের ভাষায় ঃ

> India wanted to increase her influence in the Subcontinent and maintain her superiority in the region and the Bangladeshis wanted to win over the war and gain their independence. India's desire to weaken Pakistan, her enemy number one, coincided with the aspirations of the Bengali nationalist forces.[৪৫]

এই কৌশলগত স্বার্থের ঐক্যই (convergence of interest) একাত্তর সালে ভারত এবং বাংলাদেশকে কাছাকাছি নিয়ে,আসে। কিন্তু ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর

৪৫। Moudud Ahmed, *Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman,* Dhaka : UPL, 1983, p. 182.

থেকেই এ সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরতে শুরু করে। অনেকেরই এই অভিমত যে, এ সম্পর্কে চিড় ধরার পেছনেও কিন্তু ভারতের অবদানই একক এবং একতরফা। বাহাত্তর সালের প্রথম দিকে স্বাধীনতার সেই উষালগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করার সময়ে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী বাহিনীর কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত অস্ত্র রসদ ও গোলাবারুদই যে কেবল নিয়ে যায় তাই নয়, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ঘরবাড়ীর মূল্যবান আসবাব পত্র সহ যা কিছু নেয়া সম্ভব সবই সীমান্তের ওপারে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য পাকিস্তানী বাহিনী ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় এবং মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপটি ছিল বাংলাদেশের ওপর ২৫ বছর মেয়াদী ভারত–বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি চাপিয়ে দেয়া যা বিষয়বস্তু, ধারা এবং স্টাইলের দিক দিয়ে এ অঞ্চলে রুশ–ভারত আধিপত্য সৃষ্টির কৌশল হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।[৪৬] এ চুক্তিকে বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ 'দিল্লীর কাছে বাংলাদেশের দাসখত' হিসেবেও বর্ণনা করেন। বাহাত্তর সালের সেপ্টেম্বরে ভারত বাংলাদেশের সম্মতি ছাড়াই পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদেরকে তাদের নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়, অথচ এটা ছিল দুদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত যৌথ ঘোষণার পরিপন্থী। স্বাধীনতার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভারতীয় সরকার বাংলাদেশের ওপর এমন বাণিজ্য চুক্তি চাপিয়ে দেয় যে চুক্তির বদৌলতে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার দশ মাইল জুড়ে অবাধ ব্যবসায় বা পণ্য সরবরাহ শুরু হয়। ফলে ভারতের পণ্য সরবরাহের মুখে এবং বাংলাদেশের যুদ্ধ–বিধ্বস্ত শিল্প কারখানার জন্যে বাংলাদেশ দারুনভাবে বাজার হারাতে থাকে। অপরদিকে ভারতে বাংলাদেশের পাট ও অন্যান্য অর্থকরী দ্রব্যের বেআইনী পাচার বৃদ্ধি পায়। একাত্তর সালের আগে যেখানে ভারতের বার্ষিক কাঁচাপাটের ঘাটতি ছিল ৫ লক্ষ বেল, ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে ভারতীয় সরকার সেখানে ৫ লক্ষ বেল পাট রফতানীর পরিকল্পনা করে।[৪৭] উল্লেখ্য এ সবের অধিকাংশই ছিল বাংলাদেশ থেকে চোরাচালান আকারে ভারতে প্রেরিত পাট যার প্রতি বেল এখানকার তুলনায় দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ বেশী দামে ভারতে বিক্রি হতো। ১৯৭৩ সনে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় তেল অনুসন্ধানে ভারত বাধা দেয় এবং কিছুকালের মধ্যেই নতুন জাগা তালপট্টি দ্বীপ দখল করে। পরে বাংলাদেশের প্রবল প্রতিবাদ ও দলিল পত্রাদির স্বাক্ষ্যে সাময়িক ভাবে ঐ দ্বীপ থেকে ভারতীয় নৌবাহিনী সরে যায়। কিন্তু সম্প্রতি আবার সেটি পুনর্দখলের উদ্যোগ নিচ্ছে ভারত। ১৯৭৪ সনে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সীমান্ত

৪৬। M. Abdul Hafiz, "Bangladesh-Pakistan Relations : Still Developing", *BIISS Journal*, Vol. 6, No. 3, 1985, p. 350.

৪৭। Nicole Ball, *Regional Conflict* and *the International System : A Case Study of Bangladesh*, ISIO Monographs, First Series, No. 1, 1974, p.49.

চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ তার ছিটমহল বেরুবাড়ীকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করার অংগীকার করে এবং অপরদিকে দহগ্রাম আংগরপোতা ছিটমহলের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে বাংলাদেশকে তিনবিঘা জায়গা দেবার কথা ভারত ঘোষণা করে। চুক্তি স্বাক্ষরের এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ বেরুবাড়ী ভারতের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু ভারত তিনবিঘা এখনও হস্তান্তর করেনি।

বাংলাদেশের পানি সমস্যা সৃষ্টিতেও ভারতের অবদান সমধিক। বলতে গেলে এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দুদেশের মধ্যে সবচেয়ে জটিল বিষয়। অভিযোগ উঠেছে যে, ভারত চাইছে বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, ভূমি ও জলবায়ুতে সুদুর প্রসারী পরিবর্তন।[৪৮] তার ফলে গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ বিনষ্ট করার লক্ষ্যে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আগত ছোট বড় সমস্ত নদীর মুখে ভারত বাঁধ নির্মাণ করে পানি উজানে টেনে নিচ্ছে। পানির এই অপব্যবহারের জন্যে একদিকে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের ভারতীয় শুকনো এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। গংগা ব্রহ্মপুত্রের পানির অভাবে বাংলাদেশের সেচ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও কৃষি অর্থনীতি পংগু হয়ে পড়ছে। এখানে উল্লেখ্য, পঁচাত্তরের প্রথম দিকে যখন কিনা বিশ্লেষকদের ভাষায় দিল্লীর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে ছিল 'খুবই মধুর' তখনও ভারতকে অনেক 'কনসেশন' দেয়ার পরও মুজিব সরকার গংগার পানির বন্টন প্রশ্নে নিছক মুখরক্ষাকারী সাময়িক ব্যবস্থা (interim arrangements) ছাড়া ভারতের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক সমাধান লাভ করেনি। তারপর পঁচাত্তরের আগষ্টে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাব হয় আরো খারাপ। সেই সাথে বাংলাদেশের ভোগান্তি এবং ক্ষতির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। অনেক উদ্যোগ, অসংখ্য আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠানের পরও দুদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত অভিন্ন নদীসমূহের পানির হিস্যা এখনও নির্ধারিত হয়নি। নির্ধারিত হবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ নদীর সংখ্যা দু–তিনটি নয়, বরং ৫৪টি। ফারাক্কার দরুন ইতিমধ্যে বাংলাদেশের 'অপূরনীয়' ক্ষতি সাধিত হয়ে গেছে। দেশের গোটা উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল শুষ্ক মওসুমে হয় প্রায় পানিশূন্য নতুবা লবণাক্ত হয়ে গেছে। এতে কৃষি উৎপাদন হয়েছে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। শুধু তাই নয় পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় মাটির অনুর্বরতা ও মরু–প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের বৃক্ষরাজির বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়েছে এবং নোনা পানির দরুন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শিল্প উৎপাদনও ব্যয়বহুল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একমাত্র ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়া যেখানে এত ভয়াবহ, সেখানে

৪৮। এস এম লুৎফর রহমান, 'উপমাহাদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও বাংলাদেশ' *সাপ্তাহিক রোববার*,১৬ আগষ্ট ১৯৮৭, পৃঃ ২৫।

তিস্তা সহ অন্য যে দশটি নদীর উজানে ভারতীয় এলাকায় বাঁধ নির্মিত হয়েছে, সময়ে তার প্রতিক্রিয়া গোটা দেশের জন্যে আরো কি ভয়াবহ ও মারাত্মক হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিরোধপূর্ণ বিষয়ের তালিকা এখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের (বি, এস, এফ) উপর্যুপরি উস্কানীমূলক হামলা, বিডিআর সহ সাধারণ নাগরিক হত্যা, সামুদ্রিক সীমা নির্ধারণ, দু-দেশের মধ্যে শত শত কোটি টাকার বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত 'শান্তি বাহিনী' পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার পেছনে ভারতীয় ইন্ধন পরিচালনার অভিযোগ এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী উপজাতীয় উদ্বাস্তদের দেশে ফিরিয়ে আনা সহ এমন কিছু দ্বিপাক্ষিক সমস্যা রয়েছে যা দুদেশের সম্পর্ককে ক্রমশঃ জটিল এবং তিক্ততর করে তুলছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ভারতের সত্যিকার পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় যে কি তা এ মুহূর্তে পরিস্কার না হলেও ইতিমধ্যে উপজাতীয় শরণার্থী ফেরত পাঠানো নিয়ে ভারত সরকারের দীর্ঘসূত্রীতা অবলম্বন, শান্তিবাহিনীর গেরিলাদের সামরিক ও প্রশিক্ষণগত সহযোগিতা প্রদান এবং ভারতীয় প্রচার মাধ্যম সমূহের ভূমিকা থেকে ভারতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলাদেশের সন্দেহ ও শংকা দিন দিন কেবল বাড়ছেই।

একজন বিশ্লেষক লিখেছেন 'সমতা ভিত্তিক সম্পর্ক উভয় দেশেরই স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বকীয়তা ও সম্মানের পথ ধরেই প্রবাহিত হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি নয়াদিল্লীর সরকারের আচরণ থেকে মনে হয়েছে মুরুব্বীর মানসিকতা থেকে তারা তাদের মুক্ত করতে পারেননি। তাদের ধারণা ও পরিকল্পনায় সুসম্পর্কের একটি মাত্র সংজ্ঞা ঃ ভারতের আঞ্চলিক ও বিশ্ব-পরিকল্পনার মধ্যে বাংলাদেশের বশংবদ অবস্থান।'[৪৯] অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সেই 'Strategic unity in the region' এর ধারণার বাস্তবায়ন।

প্রসংগত উল্লেখ্য এবং আগের এক অধ্যায়েও আমরা উল্লেখ করেছি যে, উপরোক্ত প্রেক্ষাপট সামনে থাকা সত্ত্বেও ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল্যায়ন প্রশ্নে বিশেষ করে বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি ভারতীয় ভূমিকার প্রশ্নে আমাদের এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত তথা খুবই নমনীয় মনোভাব ও দৃষ্টি ভংগীও রয়েছে।

মোটকথা, অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায় জাতীয় নিরাপত্তা নিয়েও আমাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতীয় নিরাপত্তার ধারণা, নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সমূহ—হুমকির উৎস ও ধরন নিয়ে আমাদের মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড

৪৯। দেখুন, আহমেদ হুমায়ুন , বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক,' *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ৪ মে, ১৯৮৪,পৃঃ ২১।

মতবিরোধ। অথচ জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা ও তাকে নিশ্চিত করতে হলে ইস্পাতদৃঢ় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য। কিন্তু নিরাপত্তার হুমকি এবং তার উৎস চিহ্নিত করতে গিয়েই যেখানে ঐক্যমতের অভাব রয়েছে সেখানে নিরাপত্তা রক্ষার কৌশল নির্ধারণ ও প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে আরো বেশী জটিলতা দেখা দিবে—এটাই স্বাভাবিক। আর এহেন অবস্থা চলতে থাকলে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় আমাদের অবস্থান আরো দুর্বল হয়ে পড়বে—একথাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না।

মৌলিক বিষয় সমূহে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ঃ একটি দৃষ্টিভংগী

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন অংশের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। একথা সত্য যে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের তালিকা এখানেই শেষ নয়, এমন আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিস্তর মত পার্থক্য বিদ্যমান। কাজেই সমস্ত বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারলে ভাল হতো; কেননা সমাজে বিরোধপূর্ণ বিষয় বিদ্যমান থাকার কারণেই তো ঐকমত্যের প্রশ্ন আসে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জাতীয় ঐকমত্য গঠনের ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়কেই তাদের খুটিনাটি উপাদানসহ অন্তর্ভুক্ত করা কখনোই সম্ভব হয় না এবং তা কাম্যও হতে পারে না। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এটাই বৈশিষ্ট্য যে এখানে বিভিন্ন মত ও পথের সহ অবস্থানকে মেনে নেয়া হয়। তাই ঐকমত্যের জন্যে এখানে যে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয় তাহলো প্রধান প্রধান জাতীয় বিষয় বিশেষ করে এমনকিছু মৌলিক ইস্যু বেছে নেয়া হয় যেসব বিষয়ে একটা ন্যূনতম ঐকমত্য না হলে জাতীয় জীবনে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় অগ্রগতি মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য উপরোল্লিখিত বিষয় সমূহই মৌলিক বলে প্রতীয়মান হয়। এখন প্রশ্ন হলো এ সব বিষয়ে মতামতের ক্ষেত্রে গ্রুপ ও গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে যেখানে সুস্পষ্ট মেরুকরণ (Polarization) অথবা তীব্র মতবিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে সেখানে ঐকমত্যে পৌছার সহায়ক উপায় ও দৃষ্টিভংগী কি হতে পারে? এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থবাদী গোষ্ঠী সমূহের (Interest groups) মধ্যে একটি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তাহলো নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভংগীর ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অনড় মনোভাব, বিরোধী মতের প্রতি দারুণ অসহিষ্ণুতা এবং কোন মতে সংসদে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে অথবা "মেনেজ" করতে পারলে নিজেদের সেই মতামত ও দৃষ্টিভংগীকে তারা সাংবিধানিক কায়দায় জাতির উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকেই জাতীয়

ঐকমত্য হিসেবে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াস পান। এক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভংগীটি কাজ করে তাহলো, যেহেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংকীর্ণতামূখী এবং নিষ্ক্রিয়, ব্যাপক জনসাধারণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে থাকে বিচ্ছিন্ন তারা ঐকমত্যের মর্মার্থ বোঝে না এবং এসব নিয়ে মাথাও ঘামায় না, কাজেই এলিট শ্রেণী কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সক্রিয় সমর্থন নিশ্চিত করতে পারলেই হলো তাহলেই সম্ভব নিজেদের মতামতকে জাতীয় ঐকমত্য হিসেবে উপস্থাপনা করা। এ দৃষ্টিভংগীর পেছনে মারাত্মক যে ত্রুটিটি রয়েছে ত াহচ্ছে কোন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যতই নিষ্ক্রিয় এবং সংকীর্নতামূখী হোকনা কেন, সেখানে জাতীয় ঐকমত্যের ব্যাপারটি কখনই এবং কোন ক্রমেই জনমত বিচ্ছিন্ন থেকে চেপে বসতে পারে না। আর বাংলাদেশের ব্যাপারেতো এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, এখানকার জনগণ অশিক্ষিত হলেও এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ে তারা খুব একটা মাথা না ঘামালেও অতীতে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ও সংকট সন্ধিক্ষণে অত্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে সাড়া দিয়েছে এবং যথাযথ রায়ও প্রদান করেছে। বস্তুত ঐকমত্যের রক্ষাকবচ কোন বিশেষ Regime বা সরকার প্রণীত আইন নয় বরং ব্যাপক জনগণের সমর্থনই হচ্ছে তার রক্ষাকবচ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন ছাড়া এবং তাদেরকে উদ্‌বুদ্ধ করা ছাড়া কোনো মতই ঐকমত্য হিসেবে টিকে থাকতে পারে না। সরকার বিশেষের দৃষ্টিভংগী (regime perception) এবং জাতীয় ঐকমত্যের মধ্যে এখানেই পার্থক্য।

এ কারণেই ঐকমত্যের ব্যাপারটি সব সময়ই একটি দ্বিবিধ প্রক্রিয়া (dual process) বিশেষ। এটা একদিকে যেমন ভবিষ্যতের সোপান হিসেবে সমাজের সামনে প্রাগ্রসর (enlightened) শ্রেণী কর্তৃক উপস্থাপন করার বিষয়, তেমনি তা সমাজ অভ্যন্তরস্থিত চেতনা, বিশ্বাস, মনোভাব ও উপলব্ধিকে অনুসন্ধান করারও বিষয়। প্রথমোক্তটি ঐকমত্যকে দান করে গতি এবং শেষোক্তটি একে দান করে স্থিতি ও দৃঢ়তা। জাতীয় ঐকমত্যের বিশেষত্বও এখানেই।

বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের বেলায় বিশেষ করে এখানে মৌলিক বিষয়াবলীতে বিরাজমান মতবিরোধ সমুহের অবসান ঘটাতে হলে বিভিন্ন মতামত পোষণকারী প্রতিটি দল ও গ্রুপকে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

বস্তুতঃ একথাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না যে, জাতীয় জীবনে ঐকমত্যের সন্ধান একারণেই করা হয় যাতে জাতীয় জীবনে ভায়োল্যান্স তথা সংঘাতময় পরিস্থিতির অপনোদন ঘটে।[৫০] সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকে নিশ্চিত।

৫০। এমাজউদ্দিন আহমেদ, *বাংলাদেশ ঃ রাজনীতির গতি প্রকৃতি ও অন্যান্যপ্রবন্ধ*, ঢাকা, বুক কোরাম, ১৯৮৩, পৃঃ ৯৪।

এজন্যে মুক্ত আলাপ আলোচনা, সহনশীলতা ও দৃষ্টিভংগীর আদান প্রদান আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে ঐকমত্যের ন্যূনতম ভিত্তি খোঁজার ক্ষেত্রে এসব বিষয় অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। মোটকথা গণতান্ত্রিক পরিবেশেই ঐকমত্যের শিকড় সমাজের গভীর মূলে প্রোথিত হতে পারে। এর ব্যতিক্রম যারা কামনা করেন স্বীকার করতেই হবে তারা ঐকমত্য প্রয়াসী নন অথবা ঐকমত্য সম্পর্কে তাদের ধারণা স্বচ্ছ নয়। বস্তুত জাতীয় ঐকমত্য কোন ক্রমেই চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। এটা ক্ষনস্থায়ী ব্যাপার নয়। এমনকি এটা সাময়িক ব্যবস্থাপনাও (arrangement) নয়; সরকার ও দল মতের উর্ধ্বে এর রয়েছে বিশেষ জাতীয় মর্যাদা ও স্থায়ীত্ব। ঐকমত্য নির্ধারণে একারণেই এতো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এটা অর্জন করতে পারলে জাতীয় জীবনে স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতি যেমন অর্জিত হয়, তেমনি এর ব্যত্যয় ঘটলে জাতিকে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চোরাগলিতেই হামাগুড়ি খেতে হয়। তাই এটা আজ আমাদের উপরই নির্ভর করছে আমরা কোনটাকে বেছে নেব।

আবদুর রব খান

বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পন্থাঃ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকসমূহ

ভূমিকা

সাধারনভাবে জাতীয় চরিত্রের কাম্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে এবং বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রক্রিয়া হিসেবে, 'জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা' সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী উল্লেখিত ও আলোচিত বিষয়। দেশের ক্রান্তিলগ্নে, রাজনৈতিক সংকটে, কিংবা ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যে বিষয়টির উপর আশা ব্যঞ্জক ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ। রাজনৈতিক অংগনে, বুদ্ধিজীবি ও পেশাজীবি ফোরাম, গণমাধ্যমে সর্বত্রই সংকট থেকে উত্তরনের জন্য দলমত ও গোষ্ঠীস্বার্থের উর্ধ্বে পারস্পরিক সমঝোতা স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু যেটা হতাশার দিক তা হলো জাতীয় ঐকমত্যের সন্ধানে জাতি কখনো নিছক বাগাড়ম্বর (rhetorics) বা বড়জোর বাস্তবায়নের দিকদর্শনশুন্য প্রাথমিক স্বদিচ্ছার বহিঃ প্রকাশের পর্যায় ছাড়াতে পারেনা। জাতিগঠন, সংকট মোকাবেলা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যে প্রয়াসই হোকনা কেন, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টার শুরুতেই ধরা পড়ে জাতি কত বিভক্ত, জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কত গর্ভসারশূন্য, অস্পষ্ট ও মরিচিকাময় একটি লক্ষ্যবস্তু। সমস্যা ও সংকটের স্বরুপ, সমাধানের কৌশল ও পদ্ধতি, সম্পদ আহরন ও সঞ্চালন, প্রভৃতি আদর্শগত ও বাস্তব বিষয় নিয়ে যত দল ও স্বার্থগোষ্ঠী, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর সংখ্যা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। একথা সত্য যে, বহুধাবিভক্ত (plural) সমাজেতো বটেই, সমতাভিত্তিক (homogenous) সমাজেও মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর আধিক্য অপ্রত্যাশিত বা ক্ষতির কিছু নয়। কিন্তু যেটা আংশকার ও ক্ষতির কারণ তা হলো মতানৈক্য ও বিরোধ যখন কলহ ও সংঘাতের রূপ নেয় তখন অনেক সময় গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এমনকি জাতীয় অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। আরও যেটা ক্ষতির তা হলো যত বেশী ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় জাতি ততবেশী অনৈক্যের পথে ধাবিত হয়। জাতি থাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং অচলাবস্থার মধ্যে দোদুল্যমান।

ঐকমত্যের এ দ্বিমুখী সংকটের প্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। *জাতীয় ঐকমত্য কিসের উপর, কাদের মধ্যে ও কি প্রক্রিয়ায়*

প্রতিষ্ঠিত হবে, বাংলাদেশের প্রসংগে ইহাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বস্তুতঃ জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পথা সমূহ নিয়ে বাংলাদেশের তো বটেই, সাম্প্রতিক কালের বিশেষজ্ঞ মহলে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যান্য ফোরামেও এটা খুবই কম আলোচিত হচ্ছে।[১] এই আপাতঃ বৈসাদৃশ্যের জন্য দায়ী সম্ভবত ঐকমত্য, প্রত্যয়টি নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের বিমূর্ত ও মেরুকৃত অবস্থান যার প্রয়োগিক (empirical) মূল্য খুবই কম। সাধারনভাবে সমাজের রাজনৈতিকভাবে সচেতন এক বড় অংশ যখন জাতীয় জীবনের সম্পদ, অধিকার, মর্যাদা ও কতৃর্ত্বের বন্টন নিয়ে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ও সচেতনভাবে (চাপ, হুমকি বা বলপ্রয়োগ ছাড়াই) একমত হন তখন তাকেই বলা যায় ঐকমত্য ।[২]

এটা অবশ্যই সচরাচর ব্যবহৃত, বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত সংজ্ঞা।কিন্তু এর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ ও অবস্থান আমাদেরকে উপরোল্লেখিত বিমূর্তেও মেরুকৃত অবস্থানের একপ্রান্তে দাঁড় করায়। আর তা হলো ঐকমত্য একটা বর্ণনাত্বক ধারণা (descriptive and positive concept) যা সমাজ কাঠামো বা সমাজের বিভিন্ন অংশসমূহের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক নির্দেশ করে। উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ববিদদের এই অবস্থান পরবর্তীতে ঐকমত্য নিয়ে অনুসন্ধানের উৎসাহ হরণ করে, কেননা সামাজিক সম্পর্ক নির্নয়ের জন্য ঐকমত্যের বিকল্প ও আরও ফলপ্রসূ অনেক প্রত্যয় ও পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে বের করেন।[৩]

ঐকমত্য নিয়ে এই বন্ধ্যাত্যের অবসান কল্পে সমাজ বিজ্ঞানীরা যে অবস্থান নেন তাও প্রয়োগিক দিক দিয়ে অনেকটা অন্তঃসারশূন্য। প্রত্যয়টি আদর্শিক অর্থে (normative sense) ব্যবহৃত হয়েছে বটে কিন্তু ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার যে সমস্ত পূর্বশর্ত বা মাপকাঠির কথা বলা হলো তা অনেকটা বৃত্তাকার যুক্তিচক্রের (circular arguments) মত, যেমন স্থিতিশীলতা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য আবার

১। এই প্রবন্ধের উপর কাজ করতে গিয়ে বর্তমান গবেষক তথ্যপঞ্জীর জন্য গত তিন দশকের *American Journal of Political Science, Annuls of the American Academy of Political Science, Journal of Politics, Western Political Quarterly, British Journal of Political Science* প্রভৃতি পত্রিকা তল্লাশি করেছেন। এই পর্যবেক্ষনের উপর ভিত্তি করে গবেষক এ মন্তব্য করেছেন। এতে দেখা যায় ঐকমত্য নিয়ে আমেরিকা, বৃটেন, কানাডা, ও স্কান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রসংগে পঞ্চাশ ও তৎপূর্বে, ষাট ও সত্তর দশকের শুরুতে যথেষ্ট আলোচনা হলেও এর পরের সময়ে এ বিষয়ে আলোচনা প্রায় অনুপস্থিত।

২। দেখুন, এই মনোগ্রাফে সন্নিবেশিত মাহবুবুর রহমান, "জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সমস্যা", ১৯৯০; Edward Shils, " The Comcept of Consensus", *International Encyclopaedia of Social Sciences.* Vol. 3 (New York : The Cacmillan Compan andjThe free press) 1968 260

৩। দেখুন, P. H. Partridge, *Consent and Consensus* (London: Pall Mall) 1971, 77- 78

ঐকমত্য থাকলেই কেবল সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্ভব।[৪]

গণতন্ত্রে ঐকমত্য নিয়েও এমন বৃত্তাকার যুক্তি দাড় করানো যায়। এই প্রেক্ষাপটেই বর্তমান প্রবন্ধের জন্য তাত্ত্বিক পর্যায়ে প্রত্যয়টির একটা মধ্যপন্থী (middle range), কার্যকরী সংজ্ঞা (working definition) দেয়া হবে।

তবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রসঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরও কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতে হয়। প্রশ্ন থেকে যায়ঃ জাতিগঠনের জন্য ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ভূমিকা কতখানি? প্রশ্নটি বিভিন্ন কারনে প্রাসঙ্গিক। যেহেতু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রত্যয় হিসেবে জাতীয় ঐকমত্য আলোচনার সাথে জাতিগঠন (nation building) জাতীয় সংহতি স্থাপন (national integration), গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সংঘাত ব্যবস্থাপনা ও নিরসন (Confict managemant and conflict resolution) প্রভৃতি সংযুক্ত বিষয় গুলো এসে পড়বে, সেহেতু ঐকমত্য প্রত্যয়টি অপ্রয়োজনীয় ভাবে ভারবহুল হয়ে যাবার সম্ভবনা থেকে যায়। মনে হতে পারে যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্টানই হয়তো সমগ্র রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নিয়ামক। কাজেই প্রত্যয়টির ভূমি ও পরিধি সীমায়িত করার দরকার আছে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যয়টির প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় এজন্য যে এর সংজ্ঞা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র ও পরিস্থিতির মধ্যে একটা আপাতঃ বিরোধিতা আছে। বিরোধিতা আছে এজন্যে যে, সমাজ বিজ্ঞানীরা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত সম্মতি বা ঐকমত্য হওয়ার উপর জোর দেন যেখানে চাপ ও বলপ্রয়োগের স্থান নেই।[৫]

অথচ জাতীয় জীবনের যে ক্রান্তিলগ্নে বা সংকটে ঐকমত্যের প্রয়োজন হয় সেটা খুবই নাজুক সময় যখন ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহন (crisis decision making) এবং কিছুটা একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া এ সময়ে স্বার্থগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে দলীয় বা ব্যাক্তিস্বার্থে দরকষাকষির মনোভাব জেগে উঠে বলে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত মনে হয়।[৬]

৪। অনেকটা এ ধরণের প্রশ্ন তুলেছেন V.O. Key. ঐকমত্য ও স্থিতিশীলতার সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে দেখুন, তার Public Opinion and American Democracy (New York : A.A. Knopf), 1961.

৫। দেখুন Partridge, প্রাগুক্ত : ৮৮- ৮৯.

৬। উদাহরনস্বরুপ ভারতের সাম্প্রতিক পাঞ্জাব ও কাশ্মীর সংকটে ঐকমত্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রহন নিয়ে বিতর্কের জন্য দেখুন A Bhabani Sen gupta, " Limits of National Consensus", *Economic and Political Weekly*, Vol .XXV, May 5-12, 1990, 969.

কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয়, সংকটে তাৎক্ষনিক 'জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্টা' কতটুকু অর্থবহ ও উপযোগী প্রচেষ্টা।[৭]

তৃতীয়ত, এমনও হতে পারে যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সাময়িকতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক বিষয়সমূহ কিছুটা অস্পষ্ট ও কিছুটা অনির্ধারিত থাকে। ঐসব মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য থাকা অস্বাভাবিকও না। কিন্তু সে গুলো নিয়ে রাজনৈতিক খেলা (politicking or politicization) জাতীকে গুরুতর সংকটে ফেলতে পারে এবং জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা তখনই বেশী প্রয়োজন। কিন্তু উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহে দেখা যায় মতানৈক্য তাদের জন্য বড় সমস্যা নয়। বরং মতানৈক্য থাকবে অনেকটা এটাই তাদের ঐকমত্য (agree to disagree)।[৮]

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রশ্ন থেকে যায় ঃ জাতীয় ঐকমত্য কি মৌলিক বিষয়সমূহে (fundamentel issues or principles) নাকি রাজনৈতিক খেলার নিয়ম – কানুন (rules of the game) নিয়ে? এ দুয়ের মধ্যে সীমারেখাইবা কিভাবে টানবো। আরও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ঃ যেহেতু মতানৈক্য সব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কমবেশী থাকবেই সেহেতু জাতীয় প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু কি হ'বে – জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা না কি দ্বন্দ নিরসন?

চতুর্থত, দৃশ্যমান অনৈক্য মূলতঃ সমাজের প্রভাবশালী (elite) গুটিকয়েক গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যে সীমিত। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনৈক্য – এগুলো প্রধানত সমাজের প্রভাবশালীদের মধ্যেকার। যেহেতু বিশাল জনগোষ্ঠীর (mass population) মতামত পরিস্কারভাবে জানা যায়না, সেহেতু এসব প্রভাবশালী ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মতামত জনগনের মতামত বলে চালাতে পারেন; নিজেদের সুবিধা–অসুবিধাই বৃহত্তর সমাজের সুবিধা–অসুবিধা বলে চালাতে পারেন।[৯] তাছাড়া বাস্তবক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের মতামত ও ভুমিকাই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাধান্য পায়।

৭। এমনটি বলা হয় যে সংকট যত তীব্র হয় সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া তত কেন্দ্রীভূত ও সংক্ষিপ্ত হতে থাকে। এ জন্য দেখুন, Dean A. Minix, "Small Group Dynamics and Decisional Quantity During Crisis - A Norm Based Analytical Framework", *World Affairs*, Vol. 4, No. 1, Spring 1980, 38-56. আবারো দেখুন, Syed Sirajul Islam, "Pakistan's Decision-making Process in the Bangladesh Crisis (1971)," *Asian Affairs*, Jan-May 1985, 43-57.

৮। এজন্যেই সম্ভবতঃ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা বিষয়টি উন্নত গনতন্ত্রসমূহে কম আলোচিত প্রত্যয়। দেখুন পাদটীকা–২।

৯। বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন C. W. Mills, " Power Elites" in *Causes of World War* II (New York) 1958, উধৃত হয়েছে Peter Bachrach "Elite Consensus and Democracy", *Journal of Politics*, Vol. 24, No. 3 August 1962 , 439-452.

এমনকি ঐকমত্য নিয়ে বেশীরভাগ আলোচনাই প্রভাবশালীদের ঐকমত্য (elite consensus) হিসেবে চলে আসছে। তবু কথা থেকে যায় কেননা জনগণের আশা আকাংক্ষার সাথে সম্পর্কহীন সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ জনগণের উপর চেপে বসলে তা মঙ্গলজনক তো নয়ই। অনেক সময় ঘটনা প্রবাহ প্রভাবশালীদের স্বার্থের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দেয়। সাম্প্রতিক বিশ্বের ইরান, ফিলিপাইন, দক্ষিন কোরিয়া, বার্মা, চীন, নেপাল, পূর্ব ইউরোপ, খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে জনতার ক্ষমতা (people power) জাতিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। এসম্ভাবনার জন্যই বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠী যাতে একভূত জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে প্রতিকূল (?) ঐকমত্য সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্যে ভাগ্য নির্ধারনী প্রভাবশালীদের মধ্যে তৈরী হয় ষড়যন্ত্রমূলক ঐকমত্য (conspiratorial consensus)।

এ প্রেক্ষাপটেই প্রশ্ন হলোঃ জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে কাদের মধ্যে ? জাতীয় ঐকমত্য কি গঠন করার বিষয় না কি বিশাল জনগোষ্ঠীর বিক্ষিপ্ত মতামতের মধ্যে থেকে ঐকমত্যের মূলসুরটি খুঁজে নেবার বিষয়? প্রভাবশালীরা যেমন কোন সমগোষ্ঠী (homogenous group) নয় তেমনি বিশাল জনগোষ্ঠীও কোন সমভাবাপন্ন সমষ্টি নয়। তাহলে প্রভাবশালীদের মধ্যে কে প্রতিষ্ঠিত করবে ঐকমত্য আর কে কি পদ্বতিতে করবে জনমত গঠন? আবার যখন বিশাল জনগোষ্ঠীর বিক্ষিপ্ত মতামতের মধ্যে থেকে মূল সুরটি খুঁজে নেবার প্রশ্ন উঠে তখন কোনটিকে মূলসুর বলবো? তা নির্ধারনের পন্থা কি?

মুল প্রবন্ধে যাবার আগে প্রবন্ধের সীমারেখা (scope) ও সীমাবদ্ধতা (limitations) নিয়ে দুয়েকটি মন্তব্য করা যেতে পারে। প্রথমতঃ প্রবন্ধটি একটি প্রাথমিক পর্যায়ের (preliminary) অনুসন্ধানমূলক (exploratory) আলোচনা। জাতীয় ঐকমত্য বিষয়টির উপর গঠনমূলক বিতর্ক সৃষ্টি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। সে জন্যেই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন (কিসের উপর, কাদের মধ্যে ও কি প্রক্রিয়ায় জাতীয় ঐকমত্য ?) কে ঘিরে সম্পর্কযুক্ত প্রশ্ন ও সমস্যাগুলো তোলা হয়েছে প্রবন্ধের শুরুতে। সব প্রশ্ন আলোচনা করা যাবেনা এখানে। তবু প্রবন্ধে আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্রীয় প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত করে এভাবে আমরা প্রবন্ধের সীমারেখা টানবো ঃ

(ক) কিসের উপর জাতীয় ঐকমত্য ? ঃ মৌলিক বিষয় সমূহে ঐকমত্য বনাম রাজনীতির নিয়ম-কানুন সর্ম্পকে ঐকমত্য (consensuson fundamantals vs. rules of the game);

(খ) কাদের মধ্যে ঐকমত্য ? : প্রভাবশালীদের মধ্যে ঐকমত্য বনাম–বৃহত্তর জনগণ এবং প্রভাবশালী–এ দুয়ের মধ্যে ঐকমত্য (intra-elite consensus vs. between people at large and the elites);

এবং

(গ) কিভাবে বা কি প্রক্রিয়ার ঐকমত্য : ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা (কৌশল ও পদ্ধতি) বনাম মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব নিরসন (consensus building vs. conflict management and resolution)

দ্বিতীয়ত ঃ 'জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা মূলতঃ একটা আদর্শিক ধারণা (normative concept)। কি হওয়া উচিৎ–এটাই এর প্রতিপাদ্য।[১১] তাই ঐকমত্যে পৌছার পদ্ধতি আলোচনায় পদে পদে বক্তার নিজস্ব মুল্যবোধ ও ধারনার প্রতিফলন হতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যেহেতু বিতর্কের সুত্রপাত করা, মূল্যবোধের প্রতিফলন তাই আলোচনাকে খোলামেলা আয়তনে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে। তবু 'বস্তুনিষ্ঠ' আলোচনার স্বার্থে এ প্রবন্ধে ঐকমত্যে পৌছার সম্ভাব্য বিকল্প পন্থা সমূহ ও তাদের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐকমত্যের সুনির্দিষ্ট রূপ কি হবে তা আলোচনার বাইরে থাকবে।

তৃতীয়, ঐক্যমত্যের কাঠামো কিছুটা বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন এমনকি স্ববিরোধীও।[১২] ঐকমত্যের বিষয়বস্তু (content) যত বিমূর্ত (abstract) হবে ঐকমত্যের পরিধি তত

১০। উদাহরনস্বরূপ দেখুন Nilufar Choudhury, " Peoples Power in the Philippines : Quest for Democracy" *BIISS Journal,* Vol. 8, No. 2, 1987, 205-228.

১১। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ঐকমত্য' একটি বর্ননাত্মক মূল্যবোধযুক্ত (discriptive, value - free positive) প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। Comte, de Tocqucville, Durkheim প্রমুখ প্রত্যয়টিকে সমাজ পরিবর্তনের সাথে যুক্ত সুশৃঙ্খল/ বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক সম্পর্ক তথা সমাজ কাঠামোর অবস্থা বর্ননা করতে ব্যবহার করলেও সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা 'সমাজ কিভাবে সংগটিত হওয়া উচিৎ এর চেয়ে সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে (empirically) কিভাবে সংগঠিত প্রথমোক্ত অর্থে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। বর্তমান গবেষক প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে তা নির্নয় করতে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। এ প্রসংগে আরো আলোচনা প্রবন্ধের তাত্ত্বিক কাঠামো অংশে।

১২। দেখুন Shils, প্রাগুক্তঃ ১৬১।

বড়, এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে ঐকমত্য তত বেশী শক্ত হবে। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিশেষীকরণ যত বেশী করা হবে অসংলগ্নতা ও স্ববিরোধিতা তত বাড়বে।[১৩]

কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানে কোন বিষয়ের উপর ধারণাগত ঐকমত্য যখন উপস্থাপিত হয় তখন তাকে মনে হয় সেটা একটি সুশৃঙ্খল ও সংস্কৃত বক্তব্য। এই সরলীকরণ প্রক্রিয়া সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানের দিকদর্শনকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে। এটা এড়ানোর জন্য আলোচনাকে যতটা সম্ভব ব্যষ্ঠিক কাঠামোর (micro aproach) বাইরে আনার চেষ্টা করা হবে।

অত্র প্রবন্ধের প্রথম অংশে মুল প্রশ্নগুলোর তাত্ত্বিক পর্যায়ের দিকে আলোকপাত করা হবে। দ্বিতীয় অংশে স্থান পাবে প্রশ্নগুলোর বাংলাদেশ প্রেক্ষিত। তাত্ত্বিক আলোচনার শুরুতেই 'ঐকমত্য' প্রত্যয়টির একটি কার্যকরী সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে।

১। জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ঃ তাত্ত্বিক দিক

১.১ জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সংজ্ঞা ও পরিধি ঃ

সাধারণভাবে 'ঐকমত্য' কি এর সংজ্ঞা দেয়া সহজ। এবং অমরা দেখেছিও কত সহজে সেগুলো একটি চলন্তকের (continuum) দুই প্রান্তের কোন না কোন প্রান্তে অবস্থান নেয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশী দুরুহ কাজ ঐকমত্যের সুনির্দিষ্ট ও সঠিক সংজ্ঞা দেয়া। বিশেষ করে ঐকমত্যের নির্দেশক (indicators) চিহ্নিত করণ এবং ঐকমত্যের অস্তিত্বের স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত বা নজীর দেখানো খুবই কঠিন। কেননা এটা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু নয়। অনেক সময় সমাজ বিজ্ঞানীরা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক ব্যবহার, সামাজিকসম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাখ্যা কল্পে ঐকমত্য প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এতে প্রত্যয়টিয় প্রয়োগিক মূল্য (empirical value) খুব কমই পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে ব্যবহারের জন্য আমরা প্রত্যয়টির দুইটি মাপকাটি প্রয়োগ করবো ঃ প্রয়োগিক যোগ্যতা (empirical testability) এবং আদর্শিক মূল্য (normative value)। প্রয়োগিক যোগ্যতা বলতে 'ঐকমত্য' প্রত্যয়টিকে এমন কতকগুলো নির্দেশকে পরিনত করা যার মাধ্যমে ঐকমত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে বাস্তব প্রমান উপস্থিত করার যোগ্যতা বুঝানো হচ্ছে আর যেহেতু ঐকমত্যের ব্যাখ্যামূলক (explanatory) যোগ্যতার চেয়ে আদর্শিক আবেদন বেশী সে জন্য প্রয়োগযোগ্য নিদের্শকগুলো আদর্শিক দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে আমরা 'জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা' বলতে

১৩। দেখুন Partridge 'প্রাগুক্তঃ ৮৫। আরও দেখুন G .Myrdal, "Value in Social Theory" in P. Streston (ed) *A Selection of Essays on Methodology*, (London : Routledge and Kegan Poul), 1958.

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বোঝাবো ঃ

(ক) ভূমিকার ধারনা (role perception), ভূমিকার প্রত্যাশা (role expectation) এবং ভূমিকার বাস্তবতা (role playing) এর মধ্যে সঙ্গতি ও ন্যূনতম ব্যবধান,

(খ) সিদ্ধান্ত গ্রহনের ভিত্তি ও প্রক্রিয়া (base and process of decision making); এবং

(গ) কলহ ও দ্বন্দ্ব নিরসন প্রক্রিয়া (disensus and conflict management)

১.২ ঐকমত্যের বিষয়বস্তু ঃ মৌলিক বিষয় বনাম রাজনীতির নিয়মকানুন নিয়ে ঐকমত্য ঃ

ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কি বিষয়ের উপর হবে এ প্রশ্নটি এ জন্যে প্রাসঙ্গিক যে, একদিকে জাতীয় গুরত্বপূর্ন বিষয়গুলো যেমন অবিলম্বে মীমাংসিত হওয়া দরকার অন্যদিকে তেমনি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অহেতুক বিতর্কের সৃষ্টিও অনাভিপ্রেত। কেননা ঐকমত্যের সচেতন প্রয়াস কখনো কখনো জাতীয় জীবনে বিভেদ ও দ্বৈততার সৃষ্টি করে। কোন বিষয়গুলো মৌলিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের কোন পর্যায়ে কোন বিষয়ের উপর ঐকমত্য দরকার এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এসব প্রশ্নের দৃটান্তমূলক ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

যে সব সমাজবিজ্ঞানী মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন এবং যারা নিয়মকানুন, ও রীতিনীতিতে ঐকমত্যের উপর জোর দেন, উভয়ের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে যে তারা যথার্থ মনে করেন যে সমাজে অনৈক্য থাকবেই, মতানৈক্য কখনোই সম্পূর্ন দুর করা যাবেনা। কিন্তু প্রথমোক্ত দলের বক্তব্য – সমাজে কিছু না কিছু মৌলিক বিষয় থাকবেই যার উপর ঐকমত্য ঐ সমাজের অস্তিত্বের পূর্বশর্ত এবং পরবর্তীতে মতানৈক্য দূর করার জন্য ও মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য দরকার।যত বেশী অমীমাংসিত মৌলিক বিষয় থাকবে, সমাজে অনৈক্য ও অস্থিরতা তত বেশী থাকবে। পক্ষান্তরে যারা নিয়মকানুনের উপর জোর দেন তাদের বক্তব্য – যেহেতু মতানৈক্য থাকবেই সেহেতু সেই মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব কিভাবে কমানো ও নিরাময় করা যায়, সেগুলো কিভাবে জাতীয়ভাবে মোকাবেলা করা যায় সেই নিয়মকানুনে মতৈক্যই যথেষ্ট। এই বিতর্ক নিয়ে মন্তব্য করার আগে আমরা দেখি সমাজ বিজ্ঞানীরা কে কি বলেছেন।

J. S. Mill মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যের স্বপক্ষে বলেন ঃ

Whether in a democracy or in a monarchy, its essence is the same, viz., that there be in the constitution of the state something which is settled, something permanent, not to be called in question.[১৪]

১৪। J. S. Mill in *Bentham and Coleridge*, edited by F. R. Leavis, (London, and 1950.)

এ বক্তব্যে প্রথমেই যে দুটো জিনিসের উপর চোখ পড়ে তা হলো ঐকমত্যের আনুষ্ঠানিক (formal) ও অনমনীয় (inflexible, rigid) দিক। ঐকমত্য স্থায়ী হতে হবে, এটা প্রশ্নাতীত, বিতর্কের উর্দ্ধে এবং একবার ঐকমত্যে পৌছানো হলে তা দেশের শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ থাকবে। দেশের শাসনতন্ত্রের পবিত্রতা যেখানে সুনিশ্চিত, সেখানে জনমত সম্মত বিষয়গুলো, রাষ্ট্রীয় মৌলিক নীতিমালাসমূহ পরিস্কার ভাবে লিপিবদ্ধ থাকলে তাতে আর সন্দেহ, দ্ব্যর্থবোধক অনিশ্চয়তা থাকেনা। তাছাড়া জাতীয় অস্তিত্বের মূল (core of national identity) কে আবিস্কার করা ও তাকে সুস্পষ্ট স্থায়ী রুপ দেয়া জাতীয় ঐকমত্য স্থাপনের প্রথম সোপান এতেও সন্দেহ নেই। এটাও লক্ষ্যনীয় যে শাসনতন্ত্র প্রনয়ন প্রক্রিয়ার সাথে মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষনকে এক করে দেখেছেন Mill । এটা আপাত দৃষ্টিতে একটা বড় ধরনের প্রশ্নের মীমাংশা করে। তা হলো মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হবে কি প্রক্রিয়ায় ? কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতা থেকে বলা যায় শাসনতান্ত্রিক দলিলের আনুষ্ঠানিকতাই ঐকমত্যের স্থায়ী ছাপ নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শাসনতন্তের পবিত্রতা ও স্থায়ীত্ব—শাসকগোষ্ঠীর (ruling regime) বৈধতার মত মৌলিক ও বৃহত্তর প্রশ্নের সাথে জড়িত।

R. A. Dahl মৌলিক বিষয়ের মৌলিকত্ব নিয়ে আরও একধাপ পিছনে গেছেন। তার মতে ঃ

Prior to politics, beneath it, enveloping it, restricting it, conditioning it, is the underlying consensus on policy that usually exists in a society among the predominant portion of the politically active members. [১৫]

তবে Dahl ঐকমত্যের পূর্ব–অস্তিত্বে (pre-existence) বিশ্বাসী। সমাজের সক্রিয় অংশের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য থাকবে এ অনুমান করে তিনি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া নিয়ে আমাদের প্রশ্নের মোকাবিলা করেছেন। এটা সত্য যে সমাজের রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় অংশের মধ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব সর্ম্পকে মৌলিক ঐকমত্য না থাকলে ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারতো না। কিন্তু এই সত্যকে প্রশ্নাতীত সত্যের (truism, tautology) রুপ দিয়ে Dahl ঐকমত্য প্রত্যয়টির সমাজবৈজ্ঞানিক মূল্য অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছেন। আরও একটা বিরোধ এ বক্তব্যে আছে। প্রভাবশালীদের মধ্যে যে ঐকমত্য তা সব সময় মৌলিক বিষয়ে না হয়ে বেশীরভাগ সময় তা হয় পরিস্থিতির যোগাযোগ বা ঐকমত্য (marriage of convenience)। মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যের জন্য বৃহত্তর জনগনের অংশগ্রহন

১৫। R . A Dahl, *Preface to Democratic Theory* (Chicago : University of Chicago Press), 1956.

দরকার। এ বিষয়ে প্রবন্ধের পরবর্তী দুই অংশে আলোচনা করা হবে।

মৌলিক বিষয় বলতে কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ ও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ধারনকারী প্রতিষ্ঠানকে (control system of authority) বুঝালেও[১৬] এটা নিয়ে অনেক অস্পষ্ট ধারনা রয়েছে। এদিক দিয়ে Willhoitএ মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন যাতে মৌলিক বিষয়ের কার্যকরী (Operational) সংজ্ঞা পাওয়া যায়। তার মতে রাজনীতির লক্ষ্য ও মাধ্যম (ends and means of politics), যেমন দীর্ঘস্থায়ী নীতিমালা (long-term policy and principle), স্বল্পস্থায়ী নীতি (short-term issue of policy) প্রতিষ্ঠা ও প্রক্রিয়া যেমন, ভোট ব্যবস্থা, আইন প্রনয়ন, শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, আইনের শাসন এগুলোর উপর ঐকমত্য স্থাপন করা দরকার। কিন্তু মুশকিল হলো এ সুস্পষ্ট বক্তব্য আমাদেরকে খুব এগিয়ে নেয়না। কেননা মৌলিক বিষয় বনাম নীতিমালার বির্তক শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তর বিভাজনের দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়েছে।

মৌলিক বিষয় বলতে ধর্ম, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক এবং আর্থ–সামাজিক বিষয়গুলি ধরে নিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

What binds a free people together is not an agreement on fundamentals but a common way of acting inspite of disagreement on fundamentals.[১৭]

কিন্তু Ekstein[১৮] এবং E. A. Haas[১৯] যখন নীতিমালার ঐকমত্যের কথা বলতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানে আস্থা ও শৃংখলা রক্ষা ও দ্বন্দ্ব নিরসনের নিয়মকানুন মেনে চলার কথা বলেন বা লক্ষ্য অর্জনের উপায়ের উপর ঐকমত্যের কথা বলেন তখন মৌখিক বিষয় আর নিয়মকানুনের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত ক্ষীন হয়ে যায়। Bachrachএকথাই বলেছেন এভাবে ঃ

It is not a question of elites transcending their vested interests to reach a consensus on procedural norms, but rather their reaching a consensus in the substantive issues underlying the procedural norms under attack.[২০]

১৬। Shils, প্রাগুক্ত।

১৭। C. J. Friedrich, *Man and His Goverment* (New York : Mcgraw Hill), 1963.

১৮। H. Ekstein, *A Theory of Stable Democracy* (Princeton: Centre for International Studies, Princeton University) (Research Monograph No. 10) , 1961.

১৯। E. Haas, *Beyond the Nation State : Functionalism and International Organization* (Standford : Standford University Press), 1964.

২০। Peter Bachrach, "Elite Consensus and Democracy", *Journal of Politics*, Vol. 24. No. 3, August 1962, 442.

অর্থাৎ মতানৈক্যের উপর ঐকমত্য (agreeing to disagree) আসলে বাহ্যিক। এর পেছনে রয়েছে অন্তর্নিহিত সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক একাত্বতা কিংবা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার (socio-economic and political system) অস্তিতের সংগে সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠির স্বার্থের একাত্বতা বা মিল।[২১] তাছাড়া যারা নীতিমালার ঐকমত্যের কথা বলেন তারা যদি উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহের কথা মনে রেখে একথা বলেন তবুও বলা যায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহন কর্তৃপক্ষ (decision - making authority) এবং তার অধীনে অনেকটা নৈব্যক্তিক কিন্তু বিশাল আমলাতন্ত্র ছাড়া বাকী রাজনৈতিক সামাজিক স্বার্থগোষ্ঠী, সাধারন জনগনতো বটেই, নীতিমালা, প্রতিষ্ঠানিক বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব কমই ওয়াকিবহাল। উন্নয়নশীল দুনিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রসংগে তা বেশী প্রযোজ্য।

আলোচনা উপসংহারের দিকে টানার জন্য একটা কথা বলা দরকার। তা হলো মৌলিক বিষয় (fundamantal) ও পদ্ধতিগত বিষয় (procedural issues) এর মধ্যে ব্যবধানটা প্রায় সকল সমাজ বিজ্ঞানীই অনেকটা নিজ নিজ খেয়াল মত করেছেন। কোন মাপ কাঠি ব্যবহার করেননি। মৌলিক বিষয়, রাজনৈতিক আদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতিমালা এসব শব্দ এত সহজে সবার কাছে কোন না কোন অর্থ বহন করে যে এগুলোর সীমারেখা টানার প্রয়োজন কেউই বোধ করেননি। কিন্তু আমরা দেখেছি যখনই এগুলোর কার্যকরী সংজ্ঞা দেওয়া হয় তখনই শুরু হয় বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে মতানৈক্য। যাই হোক, মৌলিক বিষয় নির্ধারনের একটা মাপকাটি হতে পারে স্বার্থের নিবিড়তা (intensity of stake) কোন বিষয় হুমকির সম্মুখীন হলে যে যতটুকু বল প্রয়োগ করে তা রক্ষার জন্য প্রস্তত থাকবে বিষয়টি তার কাছে তত মৌলিক। পরিমাপের সমস্যা (measurement) দেখা দেবে এতে। বল প্রয়োগ বা ত্যাগ স্বীকারের বাস্তবায়িত পরিমাপ (ex-post measurement) সম্ভব কিন্তু পত্যাশিত পরিমাপ (ex-ante measurement) সম্ভব নয়। তাছাড়া বিষয়বস্তুর মৌলিক ও পদ্ধতিগত চরিত্রই অনেক সময় আলোচনাকে ভুল পথে নিতে পারে। কেননা আমরা দেখেছি ধর্ম বা জাতিগত পার্থক্য সব সময় ঐকমত্যের পথে অন্তরায় হয় না। আবার জেদ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা বা খেয়াল খুশীও কখনো কখনো মারাত্বক কলহ বিবাদ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পার্থক্যটা বিষয় বস্তুতে না, পার্থক্যটা পরস্পরের প্রতি ও বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি ভংগী, মনোভাব, যা আমাদের মাপ কাটিতে ভূমিকার প্রত্যাশা ও বাস্তবের মধ্যে ব্যবধানের কাছাকাছি। অর্থাৎ আমরা

২১। পশ্চিমা আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রসংগে আরও আলোচনার জন্য দেখুন, Partridge, প্রাগুক্ত ঃ96-119.

ঐকমত্য মৌলিক বিষয়ে না পদ্ধতিগত ব্যাপারে এই বিষয়ে বিভাজন বাদ দিয়ে কোন বিষয়ে মতানৈক্য তীব্র সেটা দিয়ে ঐকমত্যের ধরন বিবেচনা করব। জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও অন্যান্য মূলনীতি, সরকার কাঠামো, আইনের শাসন, বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীর এসব 'মৌলিক' বিষয়ের অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু কোন এক বিশেষ মুহূর্তে এগুলো মৌলিক মতানৈক্য সৃষ্টি না করে সাধারন বা তুচ্ছ বিষয়ও মৌলিক দ্বন্দ্বে পরিনত হতে পারে। তদুপরি মতানৈক্যের তীব্রতা আমাদেরকে ঐসব বিষয়বর'র মৌলিকত্ব সম্পর্কে প্রায়োগিক যথার্থতা (empirical validity) পরীক্ষা করতে সাহায্য করবে যে রকমটা বিষয়বস্তুর প্রাক অনুমান ভিত্তিক (a priori) বিভাজন করে না। এটা গেল বিষয়বস্তু বিভাজনের দিক। এরপর প্রশ্ন হলো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বা মতানৈক্য দূর করার জন্য কোনটার উপর জোর দেব। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই টিকে থাকার জন্য একটা জাতিকে কোথাও না কোথাও দাঁড়াতে হবে। সেটা প্রশ্নাতীত বা বিতর্কাতীত হবে কিনা এটা ভাবার বিষয়। এবং এনিয়ে আমরা আলোচনাও করবো। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট অতিরিক্ত মাত্রায় অরাজনৈতিকতা, অতিরিক্ত মাত্রায় রাজনীতিকীকরন (apolitical over-politicized) – এ দ্বিমুখী সংকট (paradox)। কাজেই প্রশ্নাতীত বা বিতর্কাতীত রাখার প্রবনতা একদিকে যেমন শাসক শ্রেনীর গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষা করে অন্যদিকে জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চরিত্রের আসল দিকটা জাতির সামনে অন্ধকারে থেকে যায়, ইতিহাস পরিবর্তন সহজসাধ্য হয়ে যায়। আবার সামান্য বিষয়ও অতি সহজে অতিরিক্ত ভাবে রাজনীতির বিষয় হয়ে পড়ে। কাজেই মতানৈক্য হোক, দ্বন্দ থাকুক কিন্তু তা যেন কখনো তীব্র না হয়, মৌলিক দ্বন্দে পরিনত না হয় এটাই হবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার নিয়ত প্রচেষ্টা।

প্রদ্ধতিগত বিষয়ে ঐকমত্যের মূল্যও কম নয়। লক্ষ্যবস্তু যেখানে অনেক সময় অস্পষ্ট সেখানে বিকল্প পথ সন্ধান দরকার হবেই। কাজেই সীমারেখার (parameters) ও পথের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে ঐকমত্য থাকা বা ন্যূনতম পক্ষে বিভিন্নতার প্রতি সহনশীল হওয়া দরকার। আমেরিকার মত উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রসংগে হলেও ১৯৩০ এর ভয়ানক মন্দার (Great Depression) সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বক্তব্য এখানে প্রনিধান যোগ্য ঃ

'The Country needs bold experimentation. Take a method and try it; *if it fails admit it* and then try another. But above all, *try something*'.[২২]

এ আলোচনা থেকে আরো একটা জিনিস বেরিয়ে আসছে। সাধারন পর্যবেক্ষন

২২। দেখুন *Time*, 1. 1. 1990: 26 .

থেকেও এটা পরিস্কার হবে যে কোন বিষয়ে ঐকমত্য থাকাটা সহজে চোখে না পড়লেও ঐকমত্য না থাকলে সেটা সহজে দৃষ্টি গোচর হয়। আর ঐকমত্য না থাকাটাই যেহেতু সমস্যা, সমাধান প্রচেষ্টা করা সেখান থেকেই শুরু করা দরকার। অর্থাৎ মতানৈক্য দুর করা, দ্বন্দ্ব নিরসন, সংকট প্রশমন ঐকমত্য প্রতিষ্টার প্রথম ও সবচেয়ে দুরহ পর্যায়। তবে এটা আংশিক প্রয়াস মাত্র। মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, কলহ নিরসন, বা প্রশমনেরও আগের একটি ধাপ আছে। তা হলো এগুলো এড়ানো বা প্রতিরোধ করা এ দুটি অন্তবর্তীকালীন ধাপের কখনো আগে, আর পরে যে ধাপটি তা হলো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা। যতটুকু ন্যুনতম ঐকমত্য আছে তার উপর ভিত্তি করে, জাতীয় চরিত্রের ধনাত্বক বা শক্তির দিকগুলো (positive points of strength) কে মূলধন করে ক্রমবর্ধমান গতিতে (incremental approach) আগানো। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার এই ধাপ বিভাজনের সাথে সাথে প্রশ্ন আসে কেন ধাপ, কাদের মধ্যে, কিভাবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশ্নে আমরা আসছি এখন।

১.৩ কাদের মধ্যে ঐকমত্য ঃ প্রভাবশালীদের মধ্যে বনাম প্রভাবশালী ও বৃহত্তর জনগনের মধ্যে ঃ

বেশীর ভাগ সমাজবিজ্ঞানীই মনে করেন ঐকমত্য সাধারনত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার প্রভাবশালীদের (elite) মধ্যে। প্রভাবশালী বলতে সাধারন ভাবে রাজনৈতিক ভাবে সবর্তনদের বুঝানো হলেও সমাজ বিজ্ঞানীরা আরও সীমাবদ্ধ অর্থে প্রভাবশালী প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সাথে পন্ডিত প্রভাবশালীদের কথাই বলা হয়ে থাকে।[২৩] তবে Rosenau, C. W. Mill, এবং J. S. Mills এর সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিব্যাপ্তি নিয়ে। ড়ওসএনঅত প্রভাবশালী বলতে জাতীয় নেতৃত্বের কাঠামো (Structure of National Leaders) বুঝিয়েছেন যার অন্তর্গত থাকবে প্রশাসনের উচ্চতর কর্মকর্তা, আইন প্রনয়নকারী, বিচারক-মন্ডলি, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব, শ্রমিক নেতা, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় নেতা, যারা জাতীয় পর্যায়ে, স্থানীয়ও প্রাদেশিক পর্যায়ের উর্দ্ধে গুরুত্বপূর্ণ এবং যাদের প্রতিষ্ঠানিক সদস্যপদ একাধিক এবং পাস্পরিক (cross-cutting membership)।[২৪] C. W. Mills [২৫] J. S. Mill [২৬] এবং Berle [২৭] এদের মধ্যে একটা মিল আছে যে তারা সমাজে ঐকমত্য

২৩। দেখুন, Partridge, প্রাগুক্তঃ, ১১৭।

২৪। J.N. Rosenau, " Consensus Building in the American National Community : Some Hypotheses and Some Supporting Data", *Journal of Politics* ,Vol. 24, No. 4, November 1962, 639-661.

২৫। C. W. Mills, প্রাগুক্ত।

২৬। J. S. Mills, প্রাগুক্ত।

২৭। A. A. Berle, " Theory of Public Consensus" উল্লেখিত, Bachrach, প্রাগুক্ত, 113.

প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা অর্জনে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা স্বীকার করেছেন। বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকার প্রসংগে আসার আগে দেখি আমরা প্রভাবশালীদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত যুক্তি কি। এ প্রসংগে সমাজ বিজ্ঞানীরা যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন তা হলো একই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ধীক্ষিত (Politically socialized), একইরকম মনোভাব, দৃষ্টিভংগী, একই রকম অভিজ্ঞতা যার ফলে একদিকে যেমন বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্ব স্ব স্বার্থবোধ (stake in the status quo) জেগে উঠে অন্যদিকে তাদের মধ্যে একটা আ অ নির্ভরশীলতা (interdependence) গড়ে উঠে।

প্রশ্ন হলো বৃহত্তর জনগনকে বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রভাবশালীদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার যথার্থতা কতখানি? বেশীরভাগ সমাজ বিজ্ঞানী বৃহত্তর জনগনের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনার অভাব, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অজ্ঞতা, অসংঙ্গবদ্ধতা, দ্ব্যর্থক ও অসংলগ্ন দৃষ্টিভংগী এসব বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছেন। পশ্চিমা উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রসংগে বিভিন্ন জরিপে এবক্তব্যের সমর্থন ও পাওয়া যায়।[২৮] কিন্তু জাতীয় জীবনে জনগনের এই নিস্ক্রিয় ভূমিকাতত্ত্ব কতখানি গ্রহন যোগ্য? বর্তমান গবেষকের ধারনা মূল সমস্যা এই প্রশ্নটির মধ্যে নয়। মূল সমস্যা বিভিন্ন সামাজিক শক্তি ও স্বার্থ গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে অপর্যাপ্ত ধারনার মধ্যে নিহিত। আমরা স্বীকার করি বা না করি, প্রত্যেকটি সামাজিক শক্তি ও স্বার্থ গোষ্ঠীর নিজ নিজ ভূমিকা আছে, নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে তাদের একটা ধারনাও (role-perception) আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য তখনই নষ্ট হয় যখন ভূমিকার ধারনা, ভূমিকার প্রত্যাশা ও ভূমিকার বাস্তবায়নের মধ্যে একটা ত্রিমুখী ব্যবধান (triangular gap between role perception, role expectation and role playing) থেকে যায়। এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য অর্জন ও রক্ষা করতে হলে ভূমিকা বিশেষীকরন (role specification) সম্ভব না হলেও ভূমিকায় একটা সীমারেখা (role boundary) টানা দরকার।

সামাজিক শক্তির ভূমিকার আংশিক পরিবর্তন জনিত সমস্যা দুরকরার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা অবশ্য প্রভাবশালীদের তালিকা বড় করেছেন। যেমন বুদ্ধিজীবিদের একটা সুনিদিষ্টি ভূমিকা প্রদান। তাদের ভূমিকা হলো শক্তিধর প্রভাবশালীদের (power elite) মধ্যে মধ্যস্থতা করা বা নতুন পথের সন্ধান দেয়া। বুদ্ধিজীবিরা গন্ডীবদ্ধ গোষ্ঠী স্বার্থের উর্দ্ধে (transcendental margin) দার্শনিক ভাবে চিন্তা করবেন ও প্রকৃত বিচারকের ভূমিকা (real tribunal) পালন করবেন এবং জনগন ও প্রভাবশালীদের

২৮। দেখুন Partridge, প্রাগুক্ত, ১১১–১১৪।

মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবেন। এমনটা বলেছেন J. S. Mill ও C. W. Mills [২৯] এটা কি অবাস্তব আদর্শ? কিছুটা, এ অর্থে যে বাস্তব নীতি প্রনয়নের কথা যখনই উঠে তখন সম্ভাব্য সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে যেটি পেছনের সারিতে যায় তাহলো বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়। প্রতমতঃ তাদের রাজনৈতিক প্রভাবের (political clout) অভাব। দ্বিতীয়ত, তাদের মতামত কে অনেক সময় বেশী 'আদর্শবাদী অবাস্তব' বলে মনে হয়। কিন্তু একথাও সত্য যে, রাজনৈতিক শক্তিধারী সামাজিক গোষ্ঠীর আন্তঃদ্বন্দ্বে মধ্যস্ততা করার জন্য ও সংকটে সমস্যায় জাতির সামনে পথের দিশা দিতে পারেন কেবল বুদ্ধিজীবিরাই। অবশ্য বুদ্ধিজীবিরাও যে স্বার্থবোধ–সম্পন্ন একটা সামাজিক গোষ্ঠী তা অনস্বীকার্য্য। বিভিন্ন সময়ে শাসক শ্রেনীর সাথে তারা বিতর্কিত সহযোগিতা মূলক ভূমিকা পালন করে থাকেন।[৩০] তারপরও যুক্তি দেখান যায় প্রভাবশালীদের মধ্য একমাত্র বুদ্ধিজীবিরাই কম পক্ষপাত–দুষ্ট, তারাই পারেন জাতির শক্তি ও দুর্বলতা, সম্পদ ও অভাব, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আত্মসমালোচকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষন করতে। প্রভাবশালী ও সাধারন জনগন এ দুয়ের মধ্যে বুদ্ধিজীবিরা পারেন একটা গঠনমূলক বিতর্কের ফোরাম সৃষ্টি করতে। J. S. Mill এর ভাষায়,

> Intellectual elites have a vital role to play in democracy, to stir and unsettle, to disrupt complacency, to lead, with their primary objective to stimulate and engender widespread public discussion.[৩১]

সামাজিক শক্তিগুলিকে যদি পিরামিড আকারের স্তর বিন্যাস হিসাবে দেখা যায় তবে পিরামিডের নীচের স্তর বৃহত্তর জনগন। যে কথাটা আগেই বলা দরকার তাহলো বাহ্যত প্রভাবশালী জনগন কোন সাদাকালো দ্বি–বিভাজন (dichotomy) নয়। আর প্রভাবশালী গোষ্ঠীও কোন অনমনীয় কাঠামো নয়। কেননা, শিক্ষা, প্রযুক্তি, সুযোগ ও সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ও অসম বন্টনের ফলে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও নব্য আধুনিক দেশে, সাধারন জনগনের স্তর থেকে নিয়ত সামাজিক উর্ধগতি (upward social mobility) প্রক্রিয়ায় প্রভাবশালীর সংখ্যা বাড়ছে। তাছাড়া বাহ্যতঃ ও বিমিড়ম্বর পর্যায়ে নেতৃত্বে ও প্রশাসনের জনগন–মুখীতা বাড়ছে। প্রতিনিধিত্ব মূলক গনতন্ত্রও এ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করেছে। কাজেই যুক্তি দেয়া যায় যে জনগনের ভূমিকা ও মতামত প্রভাবশালীদের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে। সুতরাং ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় আলাদা করে

২৯। প্রাগুক্তঃ

৩০। বুদ্ধিজীবিদের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিতর্কের জন্য দেখুন, Ashok Rudra " Emergence of Intelligentsia as a Ruling Class in India"; Andrea Beteille, *Are the Intelligentsia a Ruling Class ?;* Pranob Bardhan "The Third Dominant Class", *Economic and Political Weekly* Vol. XXIV, No 3, January 21, 1989..142-150.

৩১। Bachrach, প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত।

তাদেরকে একটি সামাজিক শ্রেণী হিসেবে গণ্য না করলেও হয়। এর সংগে যোগ করা যায় জনগন অসংগঠিত, মতামত প্রকাশের জন্য প্রভাবশালীদের উপর নির্ভরশীলতা, ইত্যাদি যুক্তি। কিন্তু সব কিছু বলার পরও কথা থেকে যায় – মনোবৃত্তি, দৃষ্টিভংগী বা স্বার্থবোধের দিক দিয়ে প্রভাবশালী জনগন একটি যথার্থ ও প্রাসংগিক বিভাজন।একই পরিবার থেকে উৎপত্তি হবার পরও এ বিভাজন থেকে যায়। কাজেই জনগনের ভূমিকার ধারনা প্রত্যাশা ও বাস্তবায়ন আলাদা। সে ভূমিকা স্বীকার করে নিতে হবে। বাইরে বাগাড়ম্বর আর অন্তঃসলিলার মত বাস্তবে মেরুকরন যত বাড়বে জনগনের ভূমিকা তত অস্বীকার করা হবে, রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার (withdrawal syndrome) উল্টোশক্তি হিসেবে ইরান–ফিলিপাইন–কোরিয়া–বার্মা–পোলাণ্ড–পূর্ব ইউরোপ–নেপাল ঘটনার তত পুনরাবৃত্তি হবে।

সাম্প্রতিক কালের জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদী (ethnic insurgency) আন্দোলন, তথা বঞ্চিত ধর্মীয় মৌলবাদ প্রভৃতি অভূতপূর্ব উর্দ্ধগতি অনেক পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকের কাছেই একটি দুর্বোধ্য বস্তু (anathema)। বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য চালক – ভূমিকার ধারনা, প্রত্যাশা ও বাস্তবায়ন এর সাহায্যে বলতে গেলে বলতে হয় প্রত্যেক সামাজিক শক্তির ভূমিকার ধারনা, প্রত্যাশা ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান থাকলেই কোননা কোন পর্যায়ে এরকম চরম আকারে বহিঃপ্রকাশ হবেই।

এ আলোচনা থেকে আমরা দুটি প্রাথমিক পর্যায়ের উপসংহার টানতে চাচ্ছি। প্রথমতঃ সামাজিক শক্তিগুলির প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ভূমিকার ধারনা ও প্রত্যাশা আছে। দ্বিতীয়তঃ স্থিতিশীল উন্নয়ন ও জাতীয় ঐকমত্যের জন্য প্রত্যেকটি সামাজিক শক্তির ভূমিকা থাকে এবং থাকা দরকার। আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলোর একটা প্রাথমিক ধারনা দিতে চেষ্টা করবো। তবে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক শক্তিগুলোর কাঠামো বিন্যাস একটা প্রায়োগিক প্রশ্ন (empirical question)। কাজেই আমাদের এ বিভাজন কেবল দৃষ্টান্তমূলক। যাই হোক, সমানরাক বিভাজনের দিক দিয়ে সামাজিক শক্তিগুলোকে আমরা বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী (interest groups) হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এবং প্রভাবশালী প্রত্যয়ের মাধ্যমে তাদের পরিচিতি দিতে পারি। যেমন ঃ

অর্থনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী (economic elite)
সমাজ নিয়ন্ত্রক প্রভাবশালী গোষ্ঠী (social control elite)
রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী (political elite)
বুদ্ধিজীবি প্রভাবশালী গোষ্ঠী (intellegentia elite)
ধর্মীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী (relegious elite)

সাধারন জনগন (common mass)

অন্যদিকে স্তর বিন্যাস মূলক বিভাজনের (hierarchical or vertical classificaftion) দিক দিয়ে আমরা এসব সামাজিক শক্তিকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি। এদের স্তর বিন্যাস অনেকটা পিরামিডের মতো (চিত্র ১) । জাতীয় ঐকমত্য প্রত্যয়টির কার্যকরী সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা দেখেছি জাতীয় প্রয়াস হিসেবে প্রত্যয়টিকে কতকগুলি উপ-প্রয়াসে বিভক্ত করা যায়। যেমন ঃ জাতীয় পর্যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহনের সাথে বৃহত্তর জনগনের আশা আকাংখার সংগতি ও সংখালঘিষ্ঠের স্বার্থ সংরক্ষন, মতামত গঠন ও জাতীয় আশা আকাংক্ষা, ও জাতীয় ঐতিহ্য আবিস্কার। সামাজিক শক্তির স্তর বিন্যাসের সাথে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উপ-প্রয়াস গুলোকে সংযুক্ত করার (mapping out) একটা প্রাথমিক চেষ্টা করা হয়েছে এখানে (চিএ ১) যাতে করে সামাজিক শক্তির কোন স্তরে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় কি করা দরকার তার একটা ধারনা পাওয়া যাবে। তবে এটা বলে রাখা দরকার এটা প্রাথমিক চেষ্টা মাত্র। সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর কি রূপ হবে তা প্রায়োগিক সমীক্ষা ও জরীপ ছাড়া বলা সম্ভব না।

চিত্র ১ঃ প্রভাবশালী স্তর বিন্যাস ও জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা

১.৪ জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কিভাবে ঃ

জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে কিভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্নের উত্তর আমরা খুজঁবো পদ্ধতি দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে। পদ্ধতি আলোচনার আগে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পুর্বশর্ত ও কতকগুলি সাধারন পন্থার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট পন্ডিত মহলের আলোচনা থেকে ঐকমত্য গঠনের কতকগুলি পূর্বশর্ত পাওয়া যায়।[৩২] পূর্বশর্তগুলি নিম্নরুপ ঃ

(ক) প্রচলিত আইন কানুন, নীতি ও আদর্শের সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা,

৩২। Shils, প্রাগুক্ত।

(খ) ঐসব আইন কানুন ও নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি সার্বজনীন আনুগত্য; ও

(গ) জাতীয় পর্যায়ে সার্বিক একাত্ব বোধ

বস্তুত উন্নত বিশ্বের প্রায় বা পূর্ন বিকশিত স্থিতিশীল সমাজ বাবস্থার প্রসংগে ঐকমত্য গঠনের পূর্বশর্ত দেয়া হয়েছে এখানে। তবে একথাও সত্য যে কোন সমাজে ঐকমত্যের জন্য কিছু না কিছু মৌলিক প্রতিষ্ঠান ও নীতিমালার উপস্থিতি ও তার প্রতি আনুগত্য অবশ্যই দরকার যা আগেও বলা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে যখন সমাজে সরকারের গ্রহনযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অহরহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ব্যহত করছে, এমন কি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশল রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পাল্টে যায়, প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতার মাঝে সনাতনী প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ সমুহ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু, সেখানে উপরের পূর্বশর্ত সমূহ খুব কমই পূরন হয়। এ সমাজে নিয়মকানুন, নীতি ও মূল্যবোধে হয় বহু-মাত্রিক, আনুগত্য হয় বহুধাবিভক্ত। আপাতঃ দৃষ্টিতে এটা একটা অনতিক্রম্য দুষ্টচক্র (vicious circle)।

এ দুষ্ট চক্রের বাইরে চলে আসতে হলে যেটা দরকার তা হলো গভীর অন্তদৃষ্টি (deep introspection)। প্রত্যেক সমাজেরই একটা নিজস্ব পরিচিতি, একটা নিজস্ব স্বত্বা ও চরিত্র আছে। ঐ সমাজের উন্নতির ভিত্তি ঐ স্বত্বা বা পরিচিতি। উন্নতির শিখরে তার চেহারা, আচার আচরন উপরি কাটামো যাই হোক না কেন ঐ মৌলিক চরিত্রই তার শক্তির ও গৌরবের উৎস। ঐ জাতির উন্নতির চাবিকাঠিও তাই ঐ মৌলিক চরিত্র আবিস্কার করায়, বার বার অতীতে ফিরে আসায়। জাতীয় প্রাতিস্বিকতাকে (original trait) অস্বীকার করে কোন জাতি বড় হতে পারে না। এক কথায় বলতে গেলে যে কোন সমাজেরই মেনে চলার মত কিছু নিয়মকানুন, নীতি, মূল্যবোধ ও আনুগত্য দেবার মত কিছু মৌলিক প্রতিষ্ঠান থাকে। সে সব নিয়মকানুন, নীতি, মূল্যবোধ ও আনুগত্য দেবার মত কিছু মৌলিক প্রতিষ্ঠান থাকে। সে সব নিয়মকানুন ও প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা, তাকে কার্যকরী করে তোলার মধ্যেই জাতীয় ঐকমত্য নিহিত।

ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় Edward Shils এর পূর্বশর্ত হলো জাতীয় মূল সংস্কৃতির ধারা (central cultural system) এবং প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় (central institutional system) এর মধ্যে নিবিড় সমন্বয় ও একাত্বতা।[৩৩] যুগের ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে হয়তো বিশ্বাস, মূল্যবোধ প্রভৃতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন আসে যা মূল সংস্কৃতির ধারায় একীভূত হতে পারে। তবে সেই একীভূত হবার মাত্রা নির্ভর করবে

৩৩। ঐ।

কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির উপর । তবে এখানে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বহিঃশক্তি হিসাবে একটা গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা গ্রহন করে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন শুধু চিরাচরিত বিশ্বাস, মূল্যবোধকেই নাড়া দেয়না, কর্তৃত্ব, সম্পদ ও সুযোগের বন্টনেও আনে বড় ধরনের পরিবর্তন যা মূল সংস্কৃতির ধারা ও মূল প্রাতিষ্ঠানিক ধারার মধ্যে ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে। যারা এই প্রযুক্তিগত পূর্নবিন্যাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা যদি তাদের অংশ আর না বাড়াতে পারে তাহলেই দেখা দেয় ঐকমত্যের অংগীকার থেকে প্রত্যাহারের পালা (withdrawal syndrome) তবে প্রযুক্তিগত বা অন্যকোন বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ একটা সমাজকে কখনোই সম্পূর্ন নৈরাজ্যজনক অবস্থায় বা হবসিয়ান প্রাকৃতিক অবস্থায় (Hobbesisn state of nature) ঠেলে দেয় না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিচ্ছুরণ ও বিকেন্দ্রিকরন যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে ও প্রযুক্তির সুফল বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ফলে ঐ সকল জনগোষ্ঠীর জাতীয় মূলধারায় সম্পৃক্তকরন প্রক্রিয়া সহজতর হয়। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমুহের কর্তৃত্ব যতটুকু অক্ষুন্ন থাকে ঐকমত্যের বাধন ততটা শক্ত থাকে। তৃতীয়তঃ প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্ট নতুন পেশা ইতিবাচক মূল্যবোধ ও পূবর্তন মূল্যবোধ ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক জটিল আন্তঃক্রিয়ায় নতুন ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়। এ ঐকমত্য যত বেশী সামাজিক, রাজনৈতিক শক্তি, পেশাজিবি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী আকর্ষন করতে পারবে অনৈক্যের প্রতিশক্তি তত বেশী দূর্বল হবে। ঐকমত্য পতিষ্ঠার জন্য তাই এসব বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ ও এই সততঃ পরিবর্তনশীল অংশগ্রহন, মুল্যবোধ ও বিশ্বাসের বাস্তব অনুধাবন একান্ত প্রয়োজন।

এরপর আসা যাক দীর্ঘ মেয়াদী পন্হা সমূহের দিকে। এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রসংগে কোন আলোচনা নাই। আমেরিকার মত উন্নত সমাজের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগন নিম্নলিখিত দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন ঃ

ক) শিক্ষার ব্যপক বিস্তার (mass literacy)
খ) নগরায়ন ও সামাজিক গতিশীলতা (urbanization and social mobilization)
গ) দক্ষ গনমাধ্যম ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ (free press, free flow of informartion)
ঘ) মুক্তচিন্তা ও গণতন্ত্রমনা মধ্যবিত্ত শ্রেনীর ভিত্তি প্রসারন
ঙ) বিচ্ছিন্ন গ্রামীন ও অন্যান্য প্রান্তিক শ্রেনীকে জাতীয় মূলধারার সাথে একীকরন
চ) দারিদ্রসীমার নীচে জনগোষ্ঠরি সংখ্যা হ্রাস
ছ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জাতীয় মূল ধারায় অন্তভূক্তি

জ) কট্টর ও চরমপন্থী আদর্শ উৎসাহিত হতে পারে এমন সব দ্বন্দ্ব ও কলহের অবসান।

সন্দেহ নেই এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত পালিত হলে সমাজের বিভিন্ন শক্তিগুলো ও ব্যক্তিবর্গ 'উদ্বুদ্ধ স্বার্থ চিন্তা' (enlightened self-interest) করবে এবং তাতে যে কোন বিষয়ে ঐসব সামাজিক রাজনৈতিক শক্তি ও ব্যক্তিবর্গ মোটামুটি একটা ঐক্যের কাটামোর (consesual framework) মধ্যে মতামত পোষন করবে। তবে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো মূলতঃ সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে জড়িত দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশলের ব্যাপার। কিন্তু আমরা এমন সব সমাজ নিয়ে আলোচনা করছি যেখানে মূল সমস্যা সুধুমাত্র টিকে থাকার সমস্যা । অনুসরনীয় উন্নয়ন কৌশল নিয়ে রয়েছে হাজারো মত, হাজারো পথের দিশা। এমন পরিস্থিতিতে যথার্থ উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐকমত্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, তারপর ঐকমত্য গঠন ও তারপর স্থিতিশীলতা অর্জন কিংবা আরও অগ্রতি সাধন একটা ক্রমবিন্যাস যা অনেকটা 'ডিম আগে না মুগীর ছানা আগে' এই বির্তনের মত। তবে উপরের কতকগুলো পদক্ষেপ, বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তার, তথ্যের অবাধগতি, বিচ্ছিন্ন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠকে জাতীয় মূল্য ধারায় অন্তর্ভূক্তি, এগুলো কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়াও অর্জন করা সম্ভব। এর সঙ্গে যেটা করা যেতে পারে তা হলো বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠীর খোলামেলা আন্তঃক্রিয়া ও আদান প্রদান। যে সমাজে যত বেশী আদান প্রদানহীন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী থাকে সে সমাজে অনৈক্য তত প্রকট, মূলসুরের সংগে সম্পর্কহীন সুরে ধ্বনি তোলার প্রবনতা তত বেশী। বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে যত তাড়াতাড়ি মূল সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ধারায় আনা যায় ততই ঐকমত্য গঠনের পথ সহজতর হবে।

একদল রাষ্টবিজ্ঞানী আবার রাজনৈতিক সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ার political socialization উপর জোর দিয়েছেন। রাষ্টীয় আদর্শ, রাজনৈতিক আচার অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারনাসহ রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সমাজের সক্রিয় অংশ ও বৃহত্তর জনগন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সচেতন হতে পারে ও নির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করতে পারে। এখানে ঐকমত্যের জন্য সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো একই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সব অভিজ্ঞতা অর্জন। এজন্যই অনেক সময় রাজনৈতিক উপকথা, আচার অনুষ্ঠান, প্রতীকীব্যক্তিত্ব ইত্যাদির উপর জোর দেয়া হয়। তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী হলো যুগযুগ ধরে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য যেটা অবশ্য উন্নয়নশীল বিশ্বে একটি দুর্লভ কাংখিত বস্তু। এটাও বলা হয়ে থাকে কার্যকরী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকলে ঐকমত্যের জন্য সচেতন প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক

দলের মধ্যে এবং স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে অবাধ আন্তঃক্রিয়া ও রাজনৈতিক দরকষাকষির (political bargaining) ফলে জাতীয় ঐকমত্য গঠিত হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের যেখানে শৈশব অবস্থা কিংবা রাজনীতি যেখানে অবাধ নয় সেখানে রাজনৈতিক দরকষাকষির ফলে দলাদলি, কলহ, দ্বন্দই বৃদ্ধি পায়।

তদুপরি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও দুরুহ ব্যাপার। সে সব ক্ষেত্রে দুটো ঐতিহাসিক উপাদানের উপর জোর দেয়া হয়েছেঃ প্রথমত, একটি শ্রেনী ভেদাভেদ যুক্ত সমাজ ব্যবস্থা (hierarchical social system) যেখানে সনাতনী সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলির প্রতি সাধারন মানুষের শর্তহীন আনুগত্য থাকে, যে ব্যবস্থা অনেকটা সামন্ত ব্যবস্থারই নামান্তর। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রাধান্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগন দ্বিতীয়টির বেলায় মূলত মধ্যযুগে রাষ্ট্র ও গীর্জার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ককেই বোঝাচ্ছেন। এভাবে অর্জিত ঐকমত্যের দুটো পরস্পর বিরোধী দিক আছে। একদিকে ঐকমত্য গঠনের জন্য সনাতনী আনুগত্যের (primordial loyalty) উপর জোর দেয়া হয়েছে। অন্যদিক এটাকে অনেকটা উপর থেকে চাপানোর ঐকমত্য বলে গন্য করা যায় উন্নয়নশীল দেশ সমুহের প্রসংগে প্রথমটির একটিই ইতিবাচক দিক আছে। এসব দেশে ব্যপক নিরক্ষরতা ও আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপটে সনাতনী প্রতিষ্ঠানসমুহ অংশ গ্রহন ও উহাদের প্রতি আনুগত্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ায় সহায়ক বলে মনে করা হয়। ভারতের মত বিশাল রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অব্যাহত কার্যকারিতার জন্য বিভিন্ন বর্ন বা শ্রেনীভিত্তিক সনাতনী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয় দিকটি যদিও প্রচলিত মূল্যবোধের দৃষ্টিতে মূলত নেতিবাচক তবুও এর একটা ইতিবাচক দিক আছে যা অবশ্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে কার্যকরী করতে হয়। সেটা হলো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকারী প্রতিষ্ঠানের (authoritative institutions) কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখা। তবে একথা স্মরন রাখতে হবে যে বল বা ভীতি প্রয়োগ ব্যতীত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের অব্যাহত কর্তৃত্বের পূর্বশর্ত হলো ঐ সব প্রতিষ্ঠানের নির্ভেজাল বৈধতা।

ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন প্রয়াস হিসাবে অরেকদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একটি সুচিন্তিত চুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু এ চুক্তির ধরন কি হবে, কাদের মধ্যে হবে এ চুক্তি আর কে চুক্তির বৈধতার গ্যারান্টী দিবে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়া হয় নি। তবে এ সব অস্পষ্টতা সত্ত্বেও ঐকমত্য গঠনের চুক্তির প্রয়োজনীয়তা নেই একথা ঠিক নয়। ঐকমত্য জিনিষটা তো একধরনের চুক্তি। বিশেষ করে যখন ঐকমত্য বিঘ্নিত হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন বা কতক গোষ্ঠীর আন্তঃবিরোধের ফলে তখন একটা সচেতন চুক্তি তা লিখিতই হোক আর অলিখিতই হোক ঐকমত্য

গঠনে সহয়তা করে।

জন স্টুয়ার্ট মিল ঐকমত্য গঠনের জন্য মূল দায়িত্ব চাপিয়েছেন ক্ষমতাসীন সরকারের উপর। মিলের মতে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় মূল ধারায় আনয়নের পূর্বশর্ত হলো তাদের স্বার্থ–সংরক্ষন। যে সরকার যতবেশী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখবেন সে সরকারের ঐকমত্যের ভিত্তি তত বেশী প্রশস্ত হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তা হলো সরকার সে সব দল, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বার্থই দেখেন যারা অব্যহত ক্ষমতার জন্য সহায়ক হয়। এই স্বার্থ সংরক্ষনের ব্যাপারটি আবার সরকারের সংগে জড়িত। সার্বজনিন বৈধ সরকারকে ক্ষমতার ভিত্তি শক্ত করার জন্য কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে হয় না।

সরকার কর্তৃক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ–সংরক্ষনের কাছাকাছি আরেকটি পদক্ষেপ হলো বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেনীর মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন। বিশ্বাস স্থাপন অবশ্য এমন একটি পদক্ষেপ যা কথায় অর্জন করা যায় না। কথায় ও কাজের মিল, স্বার্থ–সংরক্ষন ইত্যাদির মাধ্যমেই কোন জনগোষ্ঠীর আস্থা আনয়ন করা যায়।

ঐকমত্য স্থাপনের জন্য আরেকটি আলোচিত ব্যবস্থা হলো সংকট প্রশমন (crisis management) ও দ্বন্দ্ব নিরসন (conflict management)। জাতীয় জীবনের অনৈক্যমূলক সংকটগুলো সাধারনত ভাবাবেগের সম্পৃক্ত হয়ে জটিল রূপ ধারন করে।[৩৪] আর ভাবাবেগের বিষয়গুলোতে ঐকমত্য পৌছা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কাজেই সর্বাগ্রে প্রয়োজন জটিল সমস্যা গুলোকে ভেংগে ভেংগে সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে পরিনত করা সেগুলোর বিভিন্ন দিক ও তাৎপর্য্য সম্পর্কে বস্তুনিষ্ট ধারনা জনসমক্ষে বা বিবাদমান দলগুলির সামনে তুলে ধরা।[৩৫] এবং ক্রমান্বয়ে সংকট প্রশমন এবং সংকট নিরসনের উপায় বের করা।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে এ পর্বের আলোচনা শেষ করবো। তাহলো জাতীয় ঐকমত্য গঠনে রাষ্ট্র যন্ত্রের ভূমিকা। বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশসমুহের রাষ্ট্রযন্ত্র জনজীবনের বস্তুগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ধ্যান ধারনা বা চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে অনেকখানি প্রভাব ফেলতে পারে। রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত নীতিমালা,

---

৩৪। এ সম্পর্কে ফলদায়ক আলোচনার জন্য দেখুন, Nils A. Butenschon, "Conflict Management in Plural societies: The Consotitutional Democracy Formula", *Scandinavian Political Studies* Nos. 1-2, 1985; 85-103.

৩৫। দেখুন, Roger D Fisher, "Fractionating Conflict" in Rager D. Fisher (ed), *International Conflict and Behavioral Science : The Craigville Papers* (New York : Basic Books), 1964.

কর্মসূচী ও বিধি নিষেধ রাষ্ট্রের গণমাধ্যম, সম্পদ, ক্ষমতা, বিশেষ করে শক্তি প্রয়োগের হাতিয়ারের উপর সরকারের মোটামুটি একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত নীতিমালা, কর্মসূচী ও বিধি নিষেধ স্বভাবতই বেশী audience পায় ও বেশী আবেদন বা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। তবে তা ঐকমত্যের সৃষ্টি করবে না জাতিকে অনৈক্যের পথে ঠেলে দেবে তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত সরকারের বৈধতা ও গ্রহনযোগ্যতা (Legitimacy and acceptability) যে সরকার জনগনের দৃষ্টিতে যত বেশী বৈধ ও গ্রহনযোগ্য কোন নীতিমালা বা কর্মসূচী ঘোষনার গ্রহনযোগ্যতা সৃষ্টির ব্যাপারে সে সরকারের তত বেশী নৈতিক ভিত্তি থাকে। সরকারের সামনে কোন নীতিমালা বা কর্মসূচী গ্রহনযোগ্য করার জন্য দুটি পথ ঃ নৈতিক ভিত্তি ও শক্তি। নৈতিক ভিত্তি থাকলেও অনেক সময় শক্তি প্রয়োগের হুমকি দিতে হয় তা বেশীর ভাগ সময়ই ফলপ্রসু হয়। কিন্তু নৈতিক ভিত্তি না থাকলে শক্তি প্রয়োগ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শুধু অনৈক্যেরই সৃষ্টি করেনা সরকারের বৈধতার ভিত্তি আরও দুর্বল করে দেয়। তবে একথাও ঠিক বৈধতা সত্ত্বেও অনেক সময় যখন কোন ঘোষিত নীতিমালা বা কর্মসূচী কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের মূলে বা অন্য কোন মৌলিক স্বার্থকে আঘাত করে তখন তা অনৈক্যের সৃষ্টি করে। এ থেকে আরেকটি উপসংহারে আমরা পৌছাতে পারি যে বৈধতা কোন খোলা চেক (carte blanche) নয়। এটা যেমন অর্জন করতে হয় তেমনি টিকিয়েও রাখতে হয়।

২। বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা

এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্কে দীর্ঘ ২৩ বৎসরে আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের সাধারন ও তৎকালীন প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল,[৩৬] ১৯৭১ সালের শুরুর দিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনা ও ২৬ শে মার্চ থেকে ৯মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একদিকে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের ফলশ্রুতি অন্যদিকে এর পিছনে রয়েছে তিলে তিলে গড়ে উঠা ও ১৯৬৯–৭০ এর রাজনৈতিক ভুমিকম্পে শিলায়িত (crystallized) জনসমর্থন ও সামগ্রিক ঐকমত্য। কাজেই রাজনৈতিক মতাদর্শে নিরপেক্ষতা (non-partisan view) বজায় রেখেও বলা

৩৬। দেখুন, G. W. Chowdhury, *Constitutional Development in Pakistan,* (London: Longman), 1959, Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in National Integration* , (Dhaka: Oxford Unitversity Press).

যায় স্বাধীনতার শুরুতে যে আর্থসামাজিক–রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তিকরে দেশের রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাত্রা শুরু করেছিল তাও ঐকমত্য ভিত্তির উপর দাড়িয়ে ছিল। আরও সঠিক করে বলতে হলে প্রভাবশালীদের মধ্যে মোটামুটি ব্যাপক ও *জনগনের মধ্যে অপরীক্ষিত তবে সাময়িক গ্রহনযোগ্যতার* উপর দাড়িয়েছিল তৎকালীন আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি। *কাজেই স্বাধীনতার পরের কয়েক বৎসরের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল দ্রুত পরিবর্তনশীল আভ্যন্তরিন ও আন্তর্জাতিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক, পরিস্থিতিতে গৃহিত ব্যবস্থা ও মৌলনীতিমালা জনগন তথা সমগ্র জাতির কাছে গ্রহনযোগ্য হয় কিনা তা যাচাই করে দেখার সময় পদ্ধতিগত ঐকমত্য (procedural consensus)* কেননা সেই মূহুর্তে জাতির প্রয়োজন ছিল সাহসী পরীক্ষা নিরীক্ষা যার সংগে সংশ্লিষ্ট অপরিহার্য ত্যাগ তিতিক্ষার জন্য জাতিও প্রস্তুত ছিল।[৩৭] কিন্তু একদিকে যেমন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মৌলনীতিমালার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা করা হয়নি অন্যদিকে জনগনের 'খোলা চেক' নতুন নতুন রাজনৈতিক অংক কসায় অপরীমিত ও সাময়িক গ্রহনযোগ্য ব্যবস্থাগুলিকেও আমরা হারিয়েছি। সেই থেকে শুরু রাজনীতির গণ্ডগোল আর অনৈক্যের তাণ্ডবলীলা। পরবর্তীতে গৃহীত ব্যবস্থা ও নীতিমালার দোষগুন আলোচনা এখানে করছি না। তাছাড়া অনেকগুলি ব্যবস্থা ও নীতিমালা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গ্রহনযোগ্য হয়েছে। কিন্তু তা ঐকমত্য ভিত্তিক আর হয়নি। আজ না আছে মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য না আছে পদ্ধতিগত ঐকমত্য। সাময়িক গ্রহণযোগ্য বা চালিয়ে নেওয়ার নীতিতে অনৈক্যের পিছনের বোঝা (backlog) ক্রমশই ভারী হচ্ছে। ইতিহাসকে ফিরিয়ে নেয়া যাবেনা, কিন্তু যেখানে আমরা দাড়িয়ে আছি এখান থেকেই পিছনের ভার কমিয়ে শুরু করতে হবে ঐকমত্য ভিত্তিক পদযাত্রা। এ প্রচেষ্টায় আমরা দেখি প্রথমে ঐকমত্য গঠনের ক্ষেত্রসমূহ কি কি।

২.১ বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের ক্ষেত্রসমূহঃ

বাংলাদেশে যে সব বিষয়ে স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অমীমাংসিত বিতর্ক চলে আসছে বা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও আর্থ–সামাজিক অনুন্নতির কারণ হিসেবে কাজ করেছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে আমরা সেগুলোকেই জাতীয় ঐকমত্য গঠনের ক্ষেত্র হিসেবে ধরবো। তবে ক্ষেত্রগুলো পরিবর্তনশীল, গত উনিশ বৎসরের অভিজ্ঞতাই তা প্রমান করে। এ মুহুর্তে আমরা ধরে নিতে পারি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে

৩৭। নেতৃত্বের ও প্রভাবশালী পর্যায়ে বাগাড়ম্বর (rhetorics) বা ফাঁকা বুলি ছিল কিনা তা পরবর্তী ইতিহাসই প্রমান করেছে কিন্তু 'প্রথম তিন বৎসর তোমাদের কিছু দিতে পারুমনা' –এ ত্যাগের নির্দেশ সম্ভবত জাতি মেনে নিয়েছিল।

আমাদের জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা দরকার ঃ

ক) জাতীয়তার স্বরুপ নির্ধারন – বাংগালী বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

খ) রাজনৈতিক পদ্ধতি ও প্রশাসনের মৌলনীতি – পার্লামেন্টারী বনাম রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার,

গ) আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের কৌশল – গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কৃষি–উপকরন বিরাষ্ট্রীয় করন বা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর,

ঘ) রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের ভুমিকা – রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামিক ব্যবস্থা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা,

ঙ) সামাজিক শক্তি সমূহের অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের ভূমিকা – বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা,

চ) বৈদেশিক নীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক

এসব বিষয়ে ঐকমত্য সমস্যা কি সে আলোচনা এ প্রবন্ধের বাইরে। তবে এ গুলোর কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট আমরা তুলে ধরতে পারি। প্রথমতঃ উপরোক্ত বিষয়সমুহের উপর ভিত্তি করে এ পর্যন্ত সত্যিকার নির্বাচন, গনভোট বা জনমত যাচাই কখনো হয়নি বলে এসব ব্যপারে জনমতের মূল সুরটি ধরা খুবই কঠিন। জনগনের ধ্যান ধারনা, মতামত বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মাধ্যম সমুহ খুবই সীমিত। সাম্প্রতিকালে সংবাদ পত্র সমূহে গ্রামীন জীবনের চিত্র তুলে ধরা হলেও সেসব প্রতিবেদনে চমক সৃষ্টির প্রবনতাই বেশী তদুপরী প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জনগনের সংগে সরকারের যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষীন। অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠীর সংগেও জনগনের যোগাযোগ অনিয়মিত। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মতামত প্রকাশের সুযোগও সীমিত। জনগনের মধ্যে ব্যাপকহারে অশিক্ষা যা সমস্ত জাতির মধ্যে ঐকমত্য গঠনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। তবে একথা বলা যায়না যে এসব বিষয় সমুহের উপর ঐকমত্যের অভাব মূলতঃ কয়েকটি মুষ্টিমেয় দল ও স্বার্থ–গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত। সংশ্লিষ্ঠ দল বা গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে (ক) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা বহুধা বিভক্ত, (খ) বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, (গ) অতি নগন্যসংখ্যক কিন্তু সাংঘাতিক প্রভাবশালী কিছু ব্যবসায়ী/শিল্পপতি, (ঘ) আমলা, (ঙ) আলেম সম্প্রদায়, (চ) ছাত্র সমাজ, এবং সেই সংগে (ছ) অধুনা সংযুক্ত এবং সম্ভবতঃ সবচেয়ে শক্তিশালী, সামরিক বাহিনী।

দ্বিতীয়ত, উল্লেখিত বিষয়সমুহ এসব দল ও স্বার্থ–গোষ্ঠীর মধ্যে এজন্যই ঐকমত্য হচ্ছেনা যে সবাই সমস্যা ও সম্ভাবনাকে বিশেষ করে জাতীয় জীবনের অত্যন্ত মৌলিক বিষয় সমূহকে নিজ দলীয়, গোষ্ঠীগত এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখেন।

জাতীয় দৃষ্টিকোন থেকে সমস্যাগুলোকে জাতীয় পর্যায়ে খুব কমই নিয়ে আসা হয়। প্রশ্নহলো এটার কারণ কি ? এটার পিছনে কাজ করে মূলতঃ একদিকে বিশ্বাসযোগ্যতা ও বৈধতার সংকট ও অন্যদিকে কাজ করে সব সুযোগ–সুবিধা নিজেদের দখলে রাখার বাসনা। এরই বা কারণ কি ? সম্ভবতঃ একটা নিরাপত্তা হীনতা যার কারণ অপ্রতুল সম্পদ ও সুযোগের জন্য নিদারুন প্রতিযোগিতা।রাজনীতিতে নতি স্বীকার বা আপোষ মানে দুর্লভ সম্পদ থেকে নিজকে বঞ্চিত করা এমন একটা মনোভাবের জন্য রাজনীতি উচ্চমূল্য (high stake in politics) আরোপ করা হয়। নিরাপত্তাহীনতা বোধ থেকেই জাগে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ ও জনগনের চোখে একে আপরকে হেয় করার প্রতিযোগীতা। এই নিরাপত্তাহীণতা থেকেই আবার কাউকে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে এর কুন্ঠা। রাজনীতিতে যে পর্যন্ত শুন্য ফলের খেলা (Zero sum game) থাকবে সে পর্যন্ত এই নিরাপত্তাহীণতা থাকবে।

তৃতীয়তঃ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও রয়েছে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল এরকম একটা সাদা–কালো দ্বিবিভাজন (dichotomy) এতে তৃতীয় মত বা মাঝামাঝি কোন মত (gray area) এর কোন সুযোগ নেই। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এটা একটা মারাত্মক বাধা এরকম দৃষ্টিভংগী শুধু ক্ষমতাসীনদের মধ্যেই না, বিরোধীদলেও আছে। এতে করে মতামতের মেরুকরণ ত্বরান্বিত হয়, মধ্যপন্থীরা স্বীকৃতি পায়না। অথচ ঐকমত্য অনেকটা মেনে নেয়ার ব্যাপার এবং এতে মধ্যপন্থীদের ভুমিকা অগ্রগন্য।

চতুর্থতঃ বিভিন্ন দল ও স্বার্থ–গোষ্ঠী গুলোর মধ্যে কোন আনুষ্ঠানিক, কাঠামোগত এবং কার্যকরী সম্পর্ক নেই। এদের মধ্যে খুব কমই সংলাপ আদান প্রদান বা আন্তঃক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। আদানপ্রদানহীন অবস্থায় এদের মধ্যে কোন ইস্যুতে ঐকমতে পৌছা খুবই কঠিন। আনুষ্ঠানিক (formal) কথাটার উপর জোর দেয়া হচ্ছে এ জন্যে যে প্রকৃত প্রস্তাবে এ সব গোষ্ঠী বা দলের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক রয়েছে যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রতুল সম্পদ ও সুযোগের জন্য প্রতিযোগিতার ফসল। কিন্তু কোন বিষয়ে যখন ভূমিকা রাখা বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রশ্ন আসে তখন যে যার আনুষ্ঠানিক জায়গায় অবস্থান নেন। এই যে প্রভাবশালী শ্রেনীর মধ্যে কোন্দল, অনৈক্য যার গণ্ডি শুধু এক গোষ্ঠীর সংগে আরেক গোষ্ঠীর সম্পর্কের মধ্যেই না একই গোষ্ঠীর ভিতরেও ছড়িয়ে পড়েছে এমন আকারে যে কেবল মাত্র বহিঃপ্রকাশেই দেশের রাজনৈতিক–আর্থনৈতিক স্থিতিশলিতার ভিত্তি ধ্বসে পড়ে। সেদিকে দিয়ে দেখতে গেলে এই সব দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় মৌলিক বিষয় সমূহে ঐকমত্যর অভাবই মূল সমস্যা।

শুধু মৌলিক বিষয়ে দ্বন্দ নয়, পদ্ধতিগত এমনকি ছোটখাট বিষয়ে মতানৈক্য ও

দ্বন্দ সমাজকে বহুধা বিভক্ত করছে। সবচেয়ে লক্ষনীয় ছোটখাট ও পদ্ধতিগত দ্বন্দ কিভাবে ক্রমান্বয়ে মৌলিক দ্বন্দে পরিনত হয়। এখানে সেই আগের সমস্যা। ইস্যু যাই হোকনা কেন অবস্থান বিপরীত মেরুতেই হবে এবং ইস্যুর নিজস্ব যোগ বোধক ও বিয়োগ বোধক দিক ছাড়িয়ে ইস্যুকে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতি আদর্শে্র ভিত্তিতে মানাতে হবে। এ হলো আমাদের রাজনীতির চিরাচরিত মূল্যবোধ। আমরা আমাদের বিরোধীদলীয় মনোভাব ও রাজনীতির পুরানো খেলার নিয়ম এখনো পাল্টাতে পারিনি।

আরেক সমস্যা সিদ্ধান্ত গ্রহন পদ্ধতি। সম্পদ আহরন, বন্টন, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন, বৈদেশিক নীতি প্রনয়ন ও সম্পর্ক স্থাপন সর্বত্রই ঐকমত্য প্রক্রিয়া অনুপস্থিত। এ কথা সত্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহন অনেকটা আনুষ্ঠানিক (formal) ও কলাকৌশলগত (technical) বিষয়। আমলাতান্ত্রিক ও কারিগরী প্রক্রিয়ায় নীতিমালা প্রনয়ন, পরিকল্পনা প্রনয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এটা এড়ানোর কৌশল (evasive technique) মাত্র। প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক দিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, গোষ্ঠীর বা প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহন ও মূল্যায়ন সম্ভব। এমনকি আনুষ্ঠানিক ও কারিগরী প্রক্রিয়ারও রাজনৈতিক দিক আছে। কাগজে কলমে উত্তম পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত জনগন বা সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠী গ্রহন না করলে বা বাস্তবায়নে বাধা দিলে তার মূল্য কোথায় রইলো ? আর জনগনমুখী প্রশাসনের মূল্য শুধু বাগাড়াম্বর ছাড়া কি থাকলো ? সারা দেশে যত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আধাবাস্তবায়িত অবস্থায় পড়ে আছে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এক বিরাট অংশের বাস্তবায়নের দেরীর কারন সংশ্লিষ্ট জনগন বা গোষ্ঠীর কাছে সেগুলো গ্রহন যোগ্য না হওয়া। আরও গভীরভাবে যদি খতিয়ে দেখা যায় তবে দেখাযাবে বেশীর ভাগ আপত্তি না বিরোধিতা অস্পস্ট ধারনা ও আবেগের উপর বদ্ধমূল । অগ্রিম আলোচনা না করা, চাপিয়ে দেয়া বা না বুঝানো এসব কারনই অনেক সময় বিরোধিতা বা অপত্তির মূলে। এসব ব্যাষ্টক পর্য্যায়ের (microlevel) উদাহরন হলেও এর অন্তর্নিহিত যুক্তি জাতীয় পর্যায়ের বড় বড় বিষয়ের বেলায়ও প্রযোজ্য।

সিদ্ধান্ত গ্রহন সমস্যার আরেকটি ক্ষতি কারক দিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অবাঞ্ছিত প্রভাব (undue influence)। এমনকি কখনো এই প্রভাব কারিগরী বা প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াকে চাপা দেয় তা হলে দেখা যাচ্ছে আমরা চাই আর না চাই সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব আসছেই। প্রশ্ন হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাব কি পরিকল্পিত ও গঠনমূলক না অপরিকল্পিত ও গুটি কয়েকের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার ?

২২ বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য পৌছার কৌশল ঃ

আমরা দেখেছি বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য পৌছার সমস্যা ত্রিবিধ ঃ এক, জাতীয় গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে জনবিচ্ছিন্নতা, দুই, মৌলিক ও পদ্ধতিগত বিষয়ে প্রভাবশালীদের মধ্যে অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব এবং কলহ ও এ দুটি সমস্যা থেকে আসছে, তিন, এক তরফা ও একযোগে সিদ্ধান্ত গ্রহন। এই প্রেক্ষাপটে আমরা এখন কয়েকটি প্রস্তাবনা রাখবো কিভাবে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সম্পর্কে।

২২১ জনবিচ্ছিন্নতা দুর করা ও জনগনের অংশগ্রহন ঃ

জাতীয় গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে জনবিচ্ছিন্নতা দুর করা ও তাতে জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্য দুটি পথ একই সংগে পাশাপাশি খোলা। প্রথমতঃ জনগনকে উদ্বুদ্ধও সচেতন মতামত প্রকাশ ও জাতীয় জীবনে সক্রিয় ভূমিকায় নিয়ে আসার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা। দ্বিতীয়তঃ তাদের আশা আকাংখা ধ্যান ধারনার সংগে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্তের সংগতি থাকার জন্য জনমত যাচাই। এর পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন মূলক (Congenial atmosphere) দুটি শর্ত পুরন করতে হবে (ক) তাথ্যের অবাধ প্রবাহ ও (খ) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। একেক করে আমরা প্রস্তাবগুলির উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব।

প্রথমতঃ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গুলি আসলে নতুন কিছুই নয়। দারিদ্র সীমার নীচে জনগোষ্ঠীর নুন্যতম প্রয়োজন মেটানো ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিনত করার সক্রিয় প্রচেষ্টা ও শিক্ষার বিস্তার – নিঃসন্দেহে এগুলো সামষ্টিক আর্থ–সামাজিক লক্ষ্য (macro socio-economic goals) জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মত পার্শ্বিক (peripheral) যুক্তি ছাড়াও আরও মৌলক যুক্তি আছে এগুলো অর্জনের এরকমটা বলার সুযোগ আছে এখানে। কিন্তু এখানেই ঐকমত্য নিয়ে ভুল ধারনা থেকে যায় আমাদের, যে আশংকা আমরা শুরুতেই করেছি। জাতীয় অগ্রগতি প্রত্যয়টিকে সঠিক অবস্থানে বসাতে হলে বলতে হয় এটা জাতীয় জীবনের (body politic) সারবস্তু (texture) নয় কিন্তু সারবস্তুর গাথুনি (fabric বা pillar)। ঐকমত্য ভিত্তিক অগ্রগতিই অগ্রগতি ঐকমত্যের অগ্রগতি চলে গেলে ঘুরে ফিরে ঐকমত্যের শক্ত মাটিতেই আবার ফিরে আসবে। যাই হোক, উপরোল্লেখিত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গুলো অবাস্তবায়িত হতে থাকলে যেমন জনবিচ্ছিন্নতা দুর হয়ে ঐকমত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকবে তেমনি পরিকল্পনা গুলো সময়মত যথাযথ বাস্তবায়িত করতে হলেও ঐকমত্যের দরকার, জনমনের অংশ গ্রহনের দরকার। আলোচনাকে সীমারেখার বাইরে না যেতে দিলেও এটুকু বলা যায় ন্যুনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য জনসম্পদ কাজে লাগিয়ে জনগনের

চাহিদা ও পছন্দমাফিক সম্পদ, অবকাঠামো ও ভোগ্যপন্য তৈরী। উন্নয়ন করা সম্ভব পূর্ব অনুমান (preconceived notion) ছেড়ে জনমন সমস্যাকে কিভাবে নেয় ও তার সমাধান কিভাবে চায় এ ধরনের কার্যকরী প্রশ্ন (operational question) পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিয়ে।

বেশীরভাগ জনগোষ্ঠী কি চায় এ প্রশ্ন আমাদের নিয়ে আসে জনমত যাচাই ও জনমত গঠন প্রসংগে। প্রথমে যে কথা বলা দরকার তা হলো আমরা বর্তমানে বাস করছি গনমাধ্যম যুগে (media–age) তথা জনমত গঠনের যুগে (mobilization of public opinion) বিচ্ছিন্ন দ্বীপ (isolated pocket) বা প্রত্যন্ত অঞ্চল (outlying area) যেখানে টেলিভিশন বা অন্য কোন গনমাধ্যম নাই সেখানে তথ্যপ্রবাহ যাচ্ছেনা বা তদনুযায়ী জনমত গঠিত হচ্ছেনা এমনটা ভেবে স্বস্তি নেবার অবকাশ নেই। এটাই গনমাধ্যম যুগের বৈশিষ্ট। তাছাড়া প্রভাবশালী, সুবিধাভোগীদের গঠন ও বিন্যাস এমন দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে যে জনমত যাচাই ও সঞ্চালন গঠন মূলক ভাবে জাতিগঠনের কাজে না লাগালে সেটা কোন না কোন প্রবঞ্চক প্রভাবশালীদের প্রভাবে ক্ষতিকারক মোড় নেবেই। বেশীর ভাগ সংখ্যালঘিষ্ট বা জাতিগত সংগ্রামের পেছনের কথাতো এটাই।

এবারে আসা যাক কিভাবে জনমত যাচাই ও জনমত গঠন করা যায়। সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন জনমত যাচাই ও জনমত গঠনের উত্তম পন্থা। কিন্তু সমস্যা হলো আজকাল নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নয় এটা মেনে নিয়েই নির্বচনী সভায় হাততালি পড়ে। আর তাছাড়া নির্বাচনে তেমন কোন আদর্শের ম্যানডেট চাওয়াও হয়না আর দেওয়াও হয়না বলে ক্ষমতাসীনদের নির্বাচনোত্তর সিদ্ধান্ত গ্রহন ও কর্মসূচী জনগনের ম্যানডেট ছাড়া হয় বলতে হবে। এ পরিস্থিতিতে *মতপ্রকাশের স্বাধীনতা* ও *সংবাদপত্রের স্বাধীনতা* জনমত প্রকাশের যাচাইয়ের ও গঠনের উত্তম রক্ষাকবজ। এটা এত বহুল আলোচিত ও ভারবহুল একটি বিষয় যে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ ও প্রয়োজন নেই এখানে। তবে একথা বলা যায় যে প্রাথমিক ভাবে ও আপাতঃ দৃষ্টিতে মুক্ত সমাজ ও মুক্ত আলোচনা স্থিতিশীলতার পরিপন্থী মনে হলেও প্রকৃতভাবে এটাই স্থিতিশীলতার রক্ষা কবচ। আর মত প্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জাতিকেই অর্জন করতে হয়। দায়ীত্বশীল সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা করার সাধ্য ও ভান (pretensions) বর্তমান গবেষকের নেই। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে গনমাধ্যম যুগের একটা বড় দিক হলো গঠনমূলক সমালোচনার যোগ বোধক দিক তুলে ধরা, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সংহত করে অন্যদিকে ঐকমত্য গঠনেরও সাহায্য করে।

জনমত যাচাইয়ের আরেকটা সুনির্দিষ্ট প্রয়াস হল জনমত জরীপ। গনমাধ্যম প্রকাশিত মতামতের সম্পুরক পদ্ধতি বিভিন্ন ইস্যুতে বা ক্রান্তিলগ্নে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্টী বা এলাকার জনমত জরীপের মাধ্যমে যাচাই করা যায়। পশ্চিমা দেশগুলিতে এটা একটা বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত পদ্ধতি। আমাদের দেশে এর প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো যে নেই তা নয়। একটি পুর্নাংগ মন্ত্রণালয় ছাড়াও বিভিন্ন পরিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠান জনসংযোগ সেল (যার উদ্দেশ্য ও কর্ম কাণ্ড অবশ্য সুনির্দিষ্ট), তাছাড়া রয়েছে বহু আর্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

২.২.২ প্রভাবশালীদের মধ্যে ঐকমত্য স্থাপন ও দ্বন্দ নিরসন ঃ

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই এ মুহুর্তে জাতীয় অনৈক্যের মূল সমস্যা হলো বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে সুযাগ সুবিধা ও ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ ও কলহ। এ দ্বন্দ ও সংকট মাঝে মাঝে এমন পর্যায়ে পৌছে যে তখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মূল সমস্যা এদের কাছে নিতান্ত তুচ্ছ মনে হয়। সেদিক দিয়ে প্রভাবশালীদের মধ্যে দ্বন্দ ও কলহ নিরসনই অগ্রধিকার পাওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন হলো কিভাবে এদের মধ্যে দ্বন্দ নিরসন সম্ভব। এদের কোন কোন দ্বন্দ আদর্শের, কোন কোন দ্বন্দ বস্তুগত স্বার্থের ও সামাজিক–রাজনৈতিক অবস্থানের আর কোন কোন দ্বন্দ পদ্ধতিগত। আমরা তাত্বিক পর্যায়ে দেখেছি দ্বন্দ নিরসনের জন্যে অনেক পদ্ধতি আছে। আমরা দেখেছি স্বাভাবিক ও পারস্পরিক স্বার্থে গঠিত প্রভাবশালী সংঘ (elite coalition bh elite association) যা প্রভাবশালী সংঘ মতবাদের মূল্যপ্রতিপাদ্য[৩৮] তা সব সময় কাজ করেনা বা তা বেশীর ভাগ সময় জনস্বার্থের পরিপন্থী হয়। Fisher–এর দ্বন্দবিভাজন (fractionating conflicts) তত্ত্বের[৩৯] নীতিগত আবেদন আছে কেননা বেশীর ভাগ সময়ই দ্বন্দ বা কলহের বিষয় আবেগ ও পার্শ্বিক উপাদান মিলে মিশ্র দ্বন্দের পর্যায়ে থাকে। এই মিশ্র দ্বন্দকে ভেঙ্গে বা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষন করে ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুতে পরিনত করতে পারলেই দ্বন্দ নিয়োজিত দল বা গোষ্ঠী গুলো ইস্যুগুলোকে বস্তুনিষ্টভাবে দেখতে পারেন। কিন্তু এ তত্ত্বের সমস্যা হলো কে করবে এই ইস্যু বিভাজন এবং কিভাবে তার দিক নির্দেশনা নেই এ তত্বে। এই তত্বের হারানো সূত্র (missing link) আমরা খুঁজে পাই সমস্যা সমাধান তত্বে (Problem Solving Approach)[৪০] যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আভ্যন্তরিন উভয় ধরনের দ্বন্দ নিরসনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই তত্বের মূল প্রতিপাদ্য

৩৮। দেখুন Butenschon, প্রাগুক্ত।

৩৯। Fisher, প্রাগুক্ত।

৪০। দেখুন, J.W. Burton, *Conflict and Communication* , London : Macmillan and New York : Free Press) 1969; J. Bercovitz, *Social Conflicts and Third Parties* , Boulder, Co. : Westview, 1984.

তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে ও সহায়তায় (moderation) দ্বন্দ নিযুক্ত পক্ষগুলো দ্বন্দের বিষয়বস্তু আলোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষন করেন। এতে প্রতিপক্ষগুলো পরস্পরেরতো বটেই নিজ নিজ দৃষ্টিভংগীর শক্ত ও নরম (strong and weak points) দিক গুলো দেখতে পাবেন এবং তাদের মধ্যে নমনীয়তা আসবে। সমস্যা সমাধান তত্বের আরেকটা দিক হলো এটা ইস্যুগুলোকে বিশ্লেষন করে সমস্যার শুন্য যোগফল মাত্রাকে যোগবোধক মাত্রায় (non-zero sum bh win - win game) পরিনত করে। প্রত্যেকটা সমস্যার প্রত্যেকটা দ্বন্দের এমন দিক ও সমাধান আছে যা সব পক্ষের মুখ রক্ষা করে (face saving) ও তাদের উদ্দেশ্য সফল করে। এর চাবিকাঠিও সাধারনভাবে লব্ধ সূত্রের (commonplace wisdom) মধ্যে নিহিতঃ পারস্পারিক আন্তঃক্রিয়া ও আদান প্রদানে অন্যের দৃষ্টি দিয়ে নিজকে দেখা।

বাংলাদেশ তথা যে কোন দেশের সামাজিক শক্তি ও প্রতাপশালীদের মধ্যে মতানৈক্য ও দ্বন্দ নিরসনের জন্য এ তত্ত্বের কালও সহানকে (time and space frame) বাড়াতে হবে বহুদল কখনো একসংঙ্গে যেমন জাতীয় সংসদ বা কোন জাতীয় সম্মেলন কখনো ভাগ ভাগ দল পর্যায়ক্রমে বা যখন যেখানে দরকার ভিত্তিতে আলোচিত সমস্যাকে বিশ্লেষন ও সমাধানের চেষ্টা করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তৃতীয় পক্ষ হবে কে বা কারা ? এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনা – *বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়*। এর যোক্তিকতা তাত্বিক পর্যায়ে আমরা দেখেছি। বুদ্ধিজীবিদের বিশ্বাসযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হতে পারে কিন্তু এ প্রশ্ন আমাদেরকে প্রশ্ন তুলতেই (begging question) সাহায্য করবে।

তবে প্রশ্ন জাগেঃ কেন সবাই এমন একটা সর্বদলীয় বা বহুদলীয় আলোচনা বা কষাকষি প্রক্রিয়ায় যেতে রাজী হবে যাতে নিজ নিজ গোষ্ঠী বা দল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এক বা একাধিক সামাজিক শক্তি বা প্রভাবশালী যখন অন্যের সাহায্য বা ভুমিকা ছাড়াই স্ব স্ব মূল্যবোধ অনুসারে সম্পদ, মর্যাদা বা কর্তৃত্বের ভাগ নিতে পারে এবং নিজ স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়া ছাড়াই প্রত্যাখিত সীমারেখা (role expectation) ছাড়িয়ে আবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারে তাহলে এ পদ্ধতি তাদের কাছে কোন আবেদনতো বহন করবেইনা বরং বিরোধিতা করবে। যদি বা তাদের স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন হয় তখন বল বা ভয়প্রদর্শন বা দলে টানা বা আতাতের মাধ্যমে সে হুমকির দুর করা তেমন কষ্টসাধ্যও নয়। এটাইতো বলভিত্তিক বাস্তব রাজনীতির (powerbased realpolitik) কথা। তবে সমস্যার গভীরতা আরও বেশী। বেশীরভাগ সামাজিক শক্তিই মনে করে যে তাদের স্ব স্ব ভুমিকার ধারাও প্রতাশা অত্যন্ত পরিস্কার, যুক্তির দিক দিয়ে, নৈতিকতার দিক দিয়ে তা অকাট্য – এতে নিজ দল বা গোষ্ঠীর অনমনীয়তা বাড়ে।

এরকম অসংখ্য সমস্যা থাকবে। তার পরও বলতে হয় সময়ের কোন না কোন বিন্দুতে কাউকে না কাউকে শুরু করতে হবে। এখানে আমরা একটা পূর্বসিদ্ধান্ত (assumption) গ্রহন করতে চাই।

জাতীয় স্বার্থের সংগে একাত্ত হবার ও জাতীয় স্বার্থে গৃহীত পদক্ষেপ সমুহকে সমর্থন করার মত একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সমাজে সব সময় থাকে। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কৌশল বলতে এদের দলকে ভারী করা বুঝায়। ভারী করার কৌশল হলো অংগীকার নিয়ে লেগে থাকা (persistent adherence) যাতে দোদুল্যমান অংশও (fence sitter, fluctuating populace) দলে যোগ দিতে পারে।[৪১]

এবং এ প্রয়াস আসবে বুদ্ধিজীবি ও মতামতের তৈরীকারক সামাজিক শক্তিগুলো থেকে বুদ্ধিজীবি ও মতামত তৈরী কারক সামাজিক শক্তিগুলো যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে নেতৃত্ব তা থেকেই গড়ে উঠবে।

২.২৩ সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া ঃ

রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ নিরসনের সাথে সম্পর্কিত একটি পদক্ষেপ হলো প্রশাসনিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের জন্য গ্রহনযোগ্য একটি সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা। এটা কোন অংশে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর কতৃত্ব ছোট করছেনা। বরং প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও গ্রহন যোগ্যতা বাড়ানোর জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহনের ভিত্তি ও প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত করা দরকার। আমরা দেখেছি ক্ষমতাসীন দলের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে গৃহিত প্রশাসনিক পদক্ষেপ, উন্নয়ন কার্যক্রম ও নীতিমালা, এমনকি আভ্যন্তরিন ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা। সংগে সংগে পরিবর্তিত হচ্ছে প্রশাসনিক, আইনগত ও কোথাও কোথাও অবকাঠামো ও উপর কাঠামো। জাতিকেই দিতে হচ্ছে তার মূল্য। এ রকম পরিবর্তন বাংলাদেশে একক কোন অভিজ্ঞতা নয়। উন্নয়নশীল বিশ্বে অহরহ এটা ঘটছে নিরাপত্তাহীনতার কারনে। ঘটছে প্রয়োজনীয় বৈধতা অর্জনের আপ্রান চেষ্টায়। কাজেই প্রত্যেকটি জাতিয় পরিকল্পনা ও প্রকল্পে আসছে মাত্রাতিরিক্ত গোষ্ঠীর ও দলীয় রং। আর পরবর্তী ক্ষমতাসীন মহল স্বাভাবিক ভাবে জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে সেগুলোর উত্তরাধিকারী হবার চেয়ে পরিস্কার শ্লেটে কাজ শুরু করার পক্ষপাতী। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রস্তাবনা ঃ

৪১। অনেকটা এ রকম বক্তব্য রেখেছেন Edward Shils, ".... every consensual pattern of belief is borne in the first instance by a persisting 'public' of adherents who gather around them, on particular issues and clusters of issues, extended and somewhat fluctuating " publics" প্রাগুক্ত Shils, পৃঃ ২৬৪।

যে কোন জাতীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে যতদুর সম্ভব বিরোধীদল ও অন্যান্য স্বার্থ-গোষ্ঠীর অংশ গ্রহন (যা তাদেরকে এ কার্যক্রমে অংগীকারাবদ্ধ করবে) ও যতদুর সম্ভব কার্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে জাতীয় চরিত্র দেয়া। সেটা অবশ্যই ক্ষমতাসীন দলের কর্মসূচী। কিন্তু যখনই সেটা পরিকল্পনা পর্যায়ে গৃহীত হলো তারপর থেকে তা জাতীয় কর্মসূচী।

কিন্তু এটা সুনিশ্চিত করার জন্য এ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে চিন্তভাবনা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন পর্যায়ে থেকে। মতানৈক্য ও দ্বন্দ সমাজে থাকবেই। এ ছাড়া সমাজে আসে স্থাবিরতা। কিন্তু মতানৈক্য ও দ্বন্দের মাধ্যমেই ঐকমত্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত (consensual decision) নেয়া সম্ভব। নীতিগত ও ব্যাখ্যামূলক উদাহরনের জন্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংস্থা আসিয়ান (ASEAN) এর ঐকমত্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা য়েতে পারে।[৪২] আসিয়ানের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) পর্দার আড়ালে (backstage) আলোচনাও দরকষাকষি (lobbying) ;

(খ) মত্যানৈক্য যত গভীরই হোকনা, প্রকাশ্যে মতানৈক্য ভিত্তিক অবস্থান সদস্য রাষ্ট্রগুলো নেয়না;

(গ) ঐকমত্যভিত্তিক অবস্থানকে অগ্রভাগে নিয়ে আসা;

(ঘ) তবে স্বার্থের কারণে মতানৈক্যের জন্য কোন সদস্যরাষ্ট্রের অংশ ছাড়াও (n-1) ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহন।

প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্র ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপ্তির সাথে জাতীয় প্রক্রিয়ার মত বৃহদাকার ও নমনীয় পরিস্থিতির তুলনায় সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেও জাতীয় ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য যে জিনিসগুলো আমরা তুলে ধরতে পারি তা হলো ঃ

(ক) সিদ্ধান্তর ভিত্তি পাকাপোক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমর্থন আদায়ের জন্য ব্যাপক আলোচনা ও দর কষাকষি;

(খ) মতানৈক্য থাকবে, তাকে অস্বীকার করে নয় বরং তাকে কিছুটা দমিয়ে রেখে ঐকমত্যের উপাদানগুলোকে অগ্রভাগে নিয়ে আসা;

(গ) সিদ্ধান্তকে জাতীয় ভিত্তিক করা ।

৪২। অনেকটা এ রকম বক্তব্য রেখেছেন Edward Shils :...... every consensual pattern of belief is borne in the first instance by a persiswting 'public" of adherents who gather around them, on particular issues and clusters of issues, extended and some what fluctuating "publics" প্রাগুক্ত Shils, পৃঃ ২৬৪।

যে জিনিসটা এ প্রক্রিয়ার পিছনে কাজ করে তা হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থা ও জাতীয় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমাধানের প্রচেষ্টা গঠনমূলক হলে বা যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবনা গ্রহণ করে ক্ষমতাসীন দল বিরোধীদলকে কৃতিত্ব দিলেও সাথে সাথে জনগণের চোখে দলের আস্থা ও বিশ্বাস যোগ্যতা বেড়ে যাবে। আবার একমত না হলেও সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা না করে বিরোধীদলও ক্ষমতাসীন দল ও জনগণের আস্থাভাজন হতে পারে। শূন্যযোগফল রাজনীতির খেলা (Zere - sum game) বদলানোর জন্য এই আস্থা ও বিশ্বাসের কোন বিকল্প নেই। এরলাভ সমগ্র জাতিতো পাবেই রাজনৈতিক দলগুলোও পাবে। এ প্রসংগে Partridge বলেন ঃ

Continuity in the policies of the successive governments, the willingness of a government in most cases to accept and build up the legislation of its predecessors, not to cancel it , is one of the things we mean by political stability. Where there is a fair measure of this type of consensus, the stakes of party competition are in most cases not often threatened; the loss of what has already been gained is not often threatened ; because there is continuity and development, there is always the hope that a defeated party will have the chance later to resume its own programmes. [৪৩]

বাস্তবে প্রাপ্তব্য অর্থে (ex-post sense) হয়তো এ উক্তির যথার্থতা (empirical validity) পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে পাওয়া যাবে কিন্তু আদর্শিক অর্থে(normative sense) এর কাম্যতা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী।

উপসংহার

এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার প্রায় দুই যুগ পরেও জাতি হিসেবে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সত্যি বলতে কি, দিন দিন আমরা এক নিম্নগতি স্কেলে গড়িয়ে পড়ছি বললে অতিরঞ্জন হবে, না হতাসাবাদ ব্যক্ত হবে, নাকি বাস্তব সত্য বলা হবে, সেটা ভেবে দেখার বিষয়। উদ্বৃত্ত–ঘাটতির তালিকায় (balance sheet) আমাদের নীট অবস্থান লোকসানের। মতানৈক্য, দ্বন্দ ও বিতর্কিত ইস্যুর সংখ্যা বেড়েই চলছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা আগেও বলেছি মতানৈক্য থাকবে। সমাজের অগ্রগতির জন্য ঐকমত্য ও মতানৈক্যের মধ্যে একটা চলমান ভারসাম্য

৪৩। দেখুন, *Partridge,* প্রাগুক্ত ১০৭–১০৮।

৪৪। এধরনের আলোচনার জন্য দেখুন, Talcott Parsows, *Essay in Sociological Theory*, (New York: Free Press). 1965.

(moving equilibrium) বজায় রাখাই যথেষ্ট।[৪৪] কিন্তু এ দুয়ের অসমতা যখন মতানৈক্যের দিকে ঝোঁকে তখনই সমাজে আসে অস্থিরতা, শুরু হয় অবক্ষয়। প্রতিষ্ঠিত ঐকমত্য ও বিতর্কের ঘুর্নিজালে আবর্তিত হয়। প্রচলিত গঠনতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিষ্ক্রিয় বা বিশ্বাসযোগ্যহীন। রাজনৈতিক ক্রিয়াবলয়ে বৃহত্তর জনগণের মূল সমস্যা – দারিদ্র, মৌলিক চাহিদা পূরণ স্থান পাচ্ছে না। রাজনৈতিক সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ায় (political socialization) এসেছে শূন্যতা (discontinuity) সবচেয়ে বড়ো কথা দেশীয় দ্বন্দশিরনাম প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও উন্নয়নের চেয়ে আমরা সবাই আজ আমাদেরই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দাতা দেশগুলোর মধ্যস্থতা মেনে নিতে প্রস্তত।[৪৫] এটা কত বড় রাজনৈতিক শূন্যতার পরিচয় বহন করে ভেবে দেখার বিষয়।

কিন্তু আশার রূপালী য়েখা নেই একথা বলা হতাশাবাদের নামান্তর। সাধারণভাবে বলতে গেলে, চরম দারিদ্র, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অস্থিরতা, দ্রুতবর্ধনভাবে জনসংখ্যা নিয়েও এবং স্বধীনতার শুরুতে দাতা দেশগুলোর হতাশাবাদ সত্ত্বেও আমরা টিকে আছি – এটা এদেশের ঐতিহাসিক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য ক্ষমতার (national vesilience) পরিচয় বহন করে। তাছাড়া আজকের উন্নত দেশগুলো তাদের জাতিগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে যে রাজনৈতিক সংকট অতিক্রম করেছে সেটা তুলনা করলে আত্মতৃপ্তির অরকাশ না থাকলেও হতাশার খুব একটা কারণ নেই । আর আমাদের অলোচনার প্রসংগে বলতে হয় বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার অনেকগুলো উপাদানই সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান। জাতি, বর্ণ,ধর্ম ও ভাষাগত সমতা (homogenity) ধর্মীয় ও সামাজিক সহনশীলতা (tolerance), উদারতা বা আলাপের মনোভাব এগুলো বাংগালীদের ঐতিহ্যগত গুন। এগুলোর রাজনৈতিক মূল্যায়ন হয়নি বলেই আজ আমাদের উল্লিখিত অবস্থা। আর ঐকমত্যের সুপ্ত উপাদানের কথাইবা শুধু বলি কেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ইতো জাতীয় ঐকমত্যের সবচেয়ে অকৃতিম রূপ, শক্ত ভিত্তি ও প্রত্যক্ষ উপাদান। বাংগালী বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে বিতর্ক।[৪৬] এবং তৎসংগে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে চলছে যে মতানৈক্য।[৪৭] সে সম্পর্কে এটুকু বলা

৪৬। ফলদায়ক বিতর্কের জন্য দেখুন মুহম্মদ জাহাংগীর (সম্পাদিত) জাতীয়তাবাদ বির্তক (ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড) ১৯৮৭ এর বিভিন্ন প্রবন্ধ।

৪৭। দেখুন, মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, Rafiuddin Ahmed (ed) *Islam in Bangladesh* (Dhaka: Bangladesh Itihash Samity), M. G. Kabir, "Post-1971 Nationalism in Bangladesh : Search For a New Identity" in M. Abdul Hafiz and Abdur Rob Khan (eds), *Nation Building in Bangladesh : Retrospect and Prospect* (Dhaka : Bangladesh Institute of International and Strategic Studies), 1986, একই লেখকের Religion, Language and Nationalism in Bangladesh",) *Journal of Contemporary Asia,* Vol. 17, No. 4, 1987: 473-487.

যায় যে বাংগালী বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি যে ভাষা ও ধর্মএ দুয়ের সম্মিলিত মিশ্র ভিত্তিতে দাড়িয়ে আছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যদিও এ দুয়ের মধ্যে কোনটি প্রধান এ নিয়ে বিতর্ক আছে[৪৮] বর্তমান প্রনন্ধকারের নিজস্ব মতামত হচ্ছে বাংগালী বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রূপ বা প্রকাশের এই বিতর্কের অন্তর্নিহিত ভূ–রাজনৈতিক–জনসংখ্যাতাত্বিক (geo-political/demographic) তাৎপর্য সম্পর্কে বর্তমানে বাংলাদেশে ঐকমত্য আছে এবং তা হলো, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিতর্ক কোন মৌলিক বিতর্ক নয় এবং এটা মৌলিক মতানৈক্যের সৃষ্টি করতে পারে না। যাই হোক, জাতীয় জীবনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভিত্তি ও সাহায্যকারী উপাদান প্রসংগে এটাও বলা যায় যে বাংলাদেশের যে গনসচেনতা আছে এবং অল্প পরিসরে এই জনসংখ্যার জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহের যে স্বাভাবিক ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি আছে তা সীমিত ভাবে হলেও সংবাদপত্র ও তথ্য প্রবাহের স্বাধীনতার রক্ষা কবজ হিসেবে কাজ করছে এবং করবে।

প্রভাবশালী (elite) ও বিভিন্ন সামাজিক শক্তি (social force) নিয়েও কিছু আশাবাদ ব্যক্ত করার অবকাশ আছে। যদিও এ সম্ভব্য অপরীক্ষিত কল্পবাক্য মাত্র। সেটা হলো শিক্ষার বিস্তার, বিকেন্দ্রীকৃত শহরায়ন, শিল্প কারখানা ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তর, মধ্যপ্রাচ্যের কর্মসুযোগ, সহজলভ্য ব্যাংক ঋণ সুবিধা, সুবিধাজনক আমদানী–রপ্তানী বাণিজ্যনীতি, লাভজনক বিপনন বাণিজ্য (distributive trade) এ সবের ফলে দ্রুতগতিতে প্রভাবশালী ও সামাজিক শক্তিসমূহের আর্বিভাব, বিকাশ ও সঞ্চালন হচ্ছে।[৪৯] এই সামাজিক শক্তি বিকাশের social formation) গতিপ্রকৃতি ও তার ভালোমন্দ বিবেচনা গুরুত্বপূর্ন তবে ভিন্ন বির্তক। কিন্তু যেটা লক্ষ্যযোগ্য সেটা হলো প্রভাবশালীদের আধিক্য (mutiplicity) জাতীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরনের শূন্যতা কিছুটা পুষিয়ে নেবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার কিছু সংখ্যকের একচেটিয়া অধিকারের (stranglehold of oligarchy) উপর চাপ ক্রমশ বাড়বে। কিন্তু কেবলমাত্র অধিক সংখ্যক সামাজিক শক্তির আবির্ভাব বা বিকাশই জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এটা এর নিজস্ব গতিতে ক্রান্তিকালীন কলহ বিবাদ ও কোন্দল বাড়িয়ে তুলবে। ভুমিকার ধারনা, ভুমিকার প্রত্যাশা ও ভূমিকা পালনের মধ্যে ব্যবধান ও সীমাছাড়ানো বেড়ে যাবে। এখানেই দরকার সচেতন ও সামগ্রিক প্রয়াসের, দরকার জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদ্বতি অনুসরনের।

৪৮। দেখুন M. G. Kabir শেষোক্ত।

৪৯। সম্প্রতি এধরনের একটি গবেষনা কাজ হয়েছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এ। দেখুন Abu Abdullah,, Rita Afsar, Atiur Rahman and Binayek Sen, *Social Formation in Dhaka City*, (Dhaka : The University Press Limited) 1990.

এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত একটি বুনিয়াদী পর্যায়ে গবেষনার ধারনা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হবে। এই প্রবন্ধে এ প্রস্তাবনা সংগতিপূর্ন।

আমরা দেখেছি বিভিন্ন সামাজিক শক্তি ও প্রভাবশালীদের ভূমিকা ধারনা ভূমিকার প্রত্যাশা ও ভূমিকা পালনের মধ্যে কোন সংগতি নেই। কিন্তু এ সংগতি স্থাপনের সচেতন প্রয়াসের প্রথম ধাপ হওয়া উচিৎ এ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক ধারনা। এ ধরনের একটা ব্যাপক জরিপ ভিত্তিক গবেষনার কাজ হাতে নিতে পারে দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন গবেষনার সাথে জড়িত গবেষনা প্রতিষ্ঠানগুলো সহযোগিতামূলক যৌথ প্রয়াসের ভিত্তিতে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ গবেষনা হওয়া উচিৎ দীর্ঘমেয়াদী এবং এ গবেষনালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক শক্তি ও প্রভাবশালীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শূরু করা উচিৎ এ গবেষনারই গুরুত্বপূর্ন অংগ হিসেবে।